পর্ব্বতবাসিনী

উপন্যাস

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত

কলিকাতা

১০১ নং, মস্জীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে

শ্রী কেদারনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১২৯০

উৎসর্গ।

যে মুখে সুধা বরষিত
সেই মুখে হাসি ফুটিবে,
এই আশা করিয়া
যে চরণে নক্ষত্র ফোটে
সেই চরণে
এই পাষাণকুসুম
অর্পিত হইল।

ভ্রম সংশোধন।

৬ পৃষ্ঠায় ২২ পংক্তিতে, "আসিয়া" স্থলে "হাসিয়া" পাঠ করিতে হইবে। আরও দুই এক স্থানে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহাতে অর্থবোধের কোন ক্ষতি হইবে না বিবেচনায়, স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল না।

পর্ব্বতবাসিনী।

আভাষ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকাপথে দুইজন পথিক। একজন বিদেশী, দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, আর একজন সেই প্রদেশবাসী, যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভের আশায় তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।

পর্ব্বতের উপরে সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত উভয়ই সুন্দর। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ, অভ্রভেদী চূড়া সমূহ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কোথাও পর্ব্বতশিখরে মেঘ জড়াইয়া উঠিতেছে। কোথাও পর্ব্বতঝরণার অবিশ্রাম ঝর ঝর শব্দ। সেই বিজন প্রদেশে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় সেই মৃদুমধুর শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া অতি গম্ভীর, ধীর গর্জ্জন করিতেছে। উপত্যকাপার্শ্বে একটা বিশাল শৃঙ্গ পথিকের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; ললাটে ভ্রূকুটী, যেন মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কদাচিৎ একটা বৃহৎ শিলাখণ্ড বজ্রনাদে খসিয়া পড়িতেছে; শৃঙ্গে শৃঙ্গে, শিখরে শিখরে, আহত প্রত্যাহত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর রবে গড়াইয়া পড়িতেছে। পথিক চমকিত, ভীত হইতেছে। চারিদিকে প্রতিধ্বনি, এই মস্তকের উপরে, এই দক্ষিণে, এই উত্তরে, ঐ দূর দিগন্তে পুনঃ পুনঃ সেই বজ্রনিনাদ।

এদিকে সূর্য্য ডুবিতেছে। এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গের পশ্চাতে লুকাইতেছে। পর্ব্বতশিখরে অস্তগামী সূর্য্যের তরল কনকপ্রবাহ, তাহার ভিতরে হরিৎবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা গুল্ম। সেইখানে মেঘ বিচরণ করিতেছে। কখন হরিণ, কখন বাঘ, কখন রাজা, কখন ভিখারী,

নানাবেশ ধারণ করিতেছে। কখন অর্ণবযানের আকারে সেই স্বর্ণসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পথিক মোহিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশের প্রান্তভাগ ক্রমে ক্রমে ধূসরবর্ণ হইয়া আসিল, কেবল মধ্যভাগ গাঢ় নীল রহিল। তখন পথপ্রদর্শক পথিককে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল, ঐ দেখুন।

পথিক নির্দ্দিষ্ট পথে চাহিয়া দেখিলেন। অনেক দূরে তুঙ্গ শৃঙ্গশ্রেণী ছাড়াইয়া আর একটা শিখর উঠিয়াছে। পথ নিতান্ত বন্ধুর, মনুষ্যের অগম্য। গিরিশৃঙ্গ আকাশভেদী, দেখিতে গেলে দৃষ্টি চলে না। মেঘমালা একবার অন্ধকার করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে, আবার ঘুরিয়া চলিয়া যাইতেছে, আবার জড়াইতেছে। পথিক অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিছু দেখিতে পাইলেন না।

পর্ব্বতবাসী জিজ্ঞাসা করিল, কিছু দেখিতে পাইতেছেন?

পথিক উত্তর করিলেন, না।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কিছু দেখিতে পাইতেছেন? মনুষ্যমূর্ত্তি, রমণীমূর্ত্তি, দেখিতে পাইতেছেন কি? বস্ত্রাঞ্চল অথবা হস্তের আন্দোলন, কিম্বা বিলম্বিত কেশ, কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি? আবার ভাল করিয়া দেখুন।

পথিক পুনরপি অতি ব্যগ্রভাবে চাহিয়া দেখিলেন। অনেক ক্ষণ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু ভরিয়া আসিল। পরিশেষে ভ্রমক্রমেই হউক অথবা যথার্থই হউক, তাঁহার বোধ হইল যেন সেই নক্ষত্রস্পর্শী পর্ব্বতশিখরে মুক্তকেশী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। পবনে তাহার বসনাঞ্চল উড়িতেছে।

পথিক ফিরিয়া সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি?

পর্ব্বতবাসী চারিদিকে চাহিয়া নমিতস্বরে কহিল, ও তারা বাই। আমরা গল্প শুনিয়াছি, সে ঐ পাহাড়ে বাস করিত। অদ্যাবধি তাহার প্রেতাত্মা পর্ব্বতশিখরে বিচরণ করে। আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন।

এই বলিয়া সে পথ দেখাইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরে প্রভাত। আকাশ বেশ পরিষ্কার, বড় কোমল, সেই কোমল আকাশের গায়ে কঠিন গিরিশৃঙ্গের ছায়া। বড় পাহাড়ের উপর ছোট ছোট গাছ, কদাচিৎ দুই একটা বড় গাছ। বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া প্রভাতপবন বহিল। পাখীগুলি গাছের ডালে বসিয়া পাখা ঝাড়িতেছিল, একে একে তাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, আবার গাছে বসিয়া পালক ফুলাইয়া প্রভাত সঙ্গীত ধরিল। নির্ঝরিণী বাঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সারারাত্রি ছুটিতেছিল—অন্ধকারে, আবার প্রভাতের আলোক পাইল। কাল পাথরে জল আছাড়িয়া পড়িয়া সাদা ঢেউ, সাদা ফেন তুলিল, সমীরণ আসিয়া তরঙ্গদল তাড়িত করিল, জল আর একটু দ্রুত ছুটিল, তরঙ্গ আর একটু উঁচু হইল, আঘাত প্রতিঘাতের বেগ আর একটু বাড়িল। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। প্রথমে পূর্ব্বদিকের নীলবর্ণ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, তার পরে ঈষৎ লাল, দেখিতে দেখিতে ঘোর লাল, সাদা সাদা দুই একখানি বিরল মেঘখণ্ড ঘোর লাল, গাছের মাথা, পাতার উপরে শিশির বিন্দু, জলের ঢেউ, ঢেউয়ের ফেণা, সব লাল। শেষে পর্ব্বতের অন্তরালে তপন উদিত হইল। মাতার স্কন্ধে উঠিয়া, জননীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে বালক যেমন হর্ষোৎফুল্ললোচনে চাহিয়া থাকে, উন্নত পাষাণস্তূপের পশ্চাতে সূর্য্য সেইরূপ উদিত হইল। নির্ঝরিণীর জলকণা, বৃক্ষপত্রে শিশিরবিন্দু, প্রতি-

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরে প্রভাত। আকাশ বেশ পরিষ্কার, বড় কোমল, সেই কোমল আকাশের গায়ে কঠিন গিরিশৃঙ্গের ছায়া। বড় পাহাড়ের উপর ছোট ছোট গাছ, কদাচিৎ দুই একটা বড় গাছ। বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া প্রভাতপবন বহিল। পাখীগুলি গাছের ডালে বসিয়া পাখা ঝাড়িতেছিল, একে একে তাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, আবার গাছে বসিয়া পালক ফুলাইয়া প্রভাত সঙ্গীত ধরিল। নির্ঝরিণী বাঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সারারাত্রি ছুটিতেছিল—অন্ধকারে, আবার প্রভাতের আলোক পাইল। কাল পাথরে জল আছাড়িয়া পড়িয়া সাদা ঢেউ, সাদা ফেন তুলিল, সমীরণ আসিয়া তরঙ্গদল তাড়িত করিল, জল আর একটু দ্রুত ছুটিল, তরঙ্গ আর একটু উঁচু হইল, আঘাত প্রতিঘাতের বেগ আর একটু বাড়িল। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। প্রথমে পূর্ব্বদিকের নীলবর্ণ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, তার পরে ঈষৎ লাল, দেখিতে দেখিতে ঘোর লাল, সাদা সাদা দুই একখানি বিরল মেঘখণ্ড ঘোর লাল, গাছের মাথা, পাতার উপরে শিশির বিন্দু, জলের ঢেউ, ঢেউয়ের ফেণা, সব লাল। শেষে পর্ব্বতের অন্তরালে তপন উদিত হইল। মাতার স্কন্ধে উঠিয়া, জননীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে বালক যেমন হর্ষোৎফুল্ললোচনে চাহিয়া থাকে, উন্নত পাষাণস্তূপের পশ্চাতে সূর্য্য সেইরূপ উদিত হইল। নির্ঝরিণীর জলকণা, বৃক্ষপত্রে শিশিরবিন্দু, প্রতি-

ক্ষিপ্ত সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। অধিত্যকা, উপত্যকা, সানুপ্রদেশ, দ্রোণি, সমুদয় আলোকিত হইল। পর্ব্বতপাদমূল হইতে গাভীগণ তৃণশস্পের আশায় গোক্ষুরচিহ্নিত পথে দ্রুতগতি পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, কোথাও বা পিচ্ছিল জানিয়া সাবধানে উঠিতে লাগিল। পথিপার্শ্বে কোথাও একটা শৃগাল শয়ন করিয়াছিল, গোশৃঙ্গ দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমকুল আহারান্বেষণে লোকালয়ে চলিল, কতক গুলা উপত্যকায় গিয়া কীটের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

পর্ব্বততল হইতে কিছু দূরে একটী বিস্তৃত দেবখাত। হ্রদ হইতে আর কিছু অন্তরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গিরিশ্রেণীর নাম সাতপুরা, গ্রামের নাম সেতারা। মহারাষ্ট্রীয় দেশে সেতারা অতি বৃহৎ নগরীর নাম, সে নগর স্বতন্ত্র।

গ্রীষ্মকাল। প্রভাতসমীরণসঞ্চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা হ্রদের কূলে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছে। গ্রামবাসীরা একে একে স্নান করিতেছে। বালকের দল ক্রীড়া করিতে আসিল। সুশীতল বায়ু সেবনে স্ফূর্ত্তি অনুভূত করিয়া তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। একজন কেবল তাহাদের খেলায় যোগ দিল না, দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিল। দুই একটী বালক খেলা ছাড়িয়া কিছু বিস্ময়ের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিতে গেলে বিস্ময়ের সহজেই উদ্রেক হয়। বালকের বেশে পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা! স্ত্রীলোকের বেশে যুবতী বলিতে হয়, কিন্তু পুরুষের বেশে বালিকা। রমণীস্বভাবশোভন লজ্জা বালিকার কিছুমাত্র ছিল না। পুরুষের বেশ, দীর্ঘায়ত সবল শরীর, বিশাল বিস্ফারিত চক্ষের দৃষ্টি স্থির, গর্ব্বিত; নিবিড় কৃষ্ণতারা, নয়নে তীব্রজ্যোতি; ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, গর্ব্ব-প্রস্ফুরিত; সরল উন্নত নাসিকা, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। দীর্ঘ, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, মুক্ত, স্কন্ধে, বুকে, পৃষ্ঠে ঝুলিতেছে। শরীর স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক, শারীরিক সুস্থতাজনিত প্রফুল্লতা মুখে লক্ষিত হইতেছে। দেহ এখনও যৌবনের পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয় নাই।

বালিকা দাঁড়াইয়া বালকদিগের খেলা দেখিতেছিল, তাহার পরে চক্ষু ফিরাইয়া পর্ব্বতশিখরে নবীন রৌদ্রের শোভা দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ

পরে ক্লান্ত দৃষ্টি শীতল জলের দিকে ফিরাইয়া তরঙ্গসমূহের উত্থানপতন দেখিতে লাগিল। এই অবসরে দ্বাদশবর্ষীয় একটী বালক সমধিক কুতূহল-পরবশ হইয়া বালিকার নিকটে আসিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়াছিল। বালিকা একটু পরেই মুখ ফিরাইয়া বালককে দেখিতে পাইল, তখন একটু হাসিয়া জলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি পদ্ম ফুল?

বহুদূরে, সেই বিস্তৃত জলরাশির গর্ভে, তরঙ্গের বক্ষপরে, বিকসিত রক্তোৎ-পল, প্রভাতসমীরণ ও তরঙ্গের তাড়নে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া হেলিতে দুলিতেছিল, এক একবার জলে নিমজ্জিত হইতেছিল।

বালক একবার বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, হাঁ।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, এমন ফুল কেউ তোলে না কেন? তুলিতে কি বারণ আছে? তোমরা কেন তোল না?

বলিতে বলিতে বালিকার নয়নপ্রান্তে একটু হাসির দেখা দিল, মাথা নাড়িয়া কথা কহিতে এক গুচ্ছ কেশ তাহার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল, বিরক্তভাবে কেশগুচ্ছ হাত দিয়া সরাইয়া ফেলিল।

বালক বলিল, এক এক দিন আমরা ভেলা বাঁধিয়া ফুল তুলি। সব দিন ভেলা বাঁধা হয় না, সকলে বারণ করে। সব দিন ফুল তোলাও হয় না। আমার ভেলায় চড়িতে ভয় করে। এক দিন আর একটু হইলে আমি ডুবিয়া গিয়াছিলাম।

বালিকা এইবার ভাল করিয়া বালকের দিকে মুখ ফিরাইল, কহিল, এতটা সাঁতার দিয়ে কি কেউ যেতে পারে না, যে ভেলা বাঁধিতে হয়? এতটা সাঁতার দেওয়া কি বড় শক্ত?

বালকের হাসি পাইল, ভয়ও বোধ হইল, বলিল, দুই একজন পারে। কিন্তু তাহারা আমাদের গাঁয়ে থাকে না। আর কেউ এতখানি সাঁতার দিতে পারে না।

বালিকার চক্ষু আর একটু চঞ্চল, মুখ আর একটু রাঙ্গা হইল, বলিল, কেন? আমি এখনই তুলিতে যাইব। এই টুকু সাঁতার দেওয়া কি এমনি একটা মস্ত কাজ না কি? এই বলিয়া বালিকা জলের দিকে অগ্রসর হইল।

বালক আর দাঁড়াইল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সম্বাদ দিল।

তাহারা আসিয়া বালিকাকে ঘিরিল। স্নানকারীরা এ সম্বাদ পাইয়া বালিকাকে নিষেধ করিতে আসিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষের মত কাপড় পরণে, এ মেয়েটা কে? এ ত আমাদের গ্রামের মেয়ে নয়। একজন বলিল, আমি উহাকে চিনি। ও রঘুজীর কন্যা, তাহার একমাত্র সন্তান। মামার বাড়ী না কোথায় থাকিত, কাল বাপের সঙ্গে গ্রামে আসিয়াছে। আসিয়াই এই কাণ্ড! কি পাহাড়ে মেয়ে বাপ্! বাপের মেয়ে বটে! আর একজন বলিল, ডুবে মরে মরুক না, আমাদের তাতে কি? একজন যুবক সকলের পশ্চাতে আসিতেছিল, সে বলিল, ও যে তারা!

সকলে মিলিয়া বালিকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ ভৎর্সনা করিতে লাগিল, কেহ বুঝাইতে আরম্ভ করিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল। বালিকা কিছুই উত্তর করে না, কেবল মুখ টিপিয়া টিপিয়া একটু একটু হাসে, আর মাঝে মাঝে এক একবার জলের দিকে একটু অগ্রসর হয়। বালিকা কাহারও কথা শুনে না দেখিয়া একজন কহিল, আমি গিয়া রঘুজীকে ডাকিয়া আনিতেছি, তোমরা সে পর্য্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখ। বাপের কাছে উচিত শাস্তি পাইবে। বালিকা তবু শোনেনা, জলের দিকেই যায়। এমন সময়ে যে যুবক কহিয়াছিল "ও যে তারা," সে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারার পরিচিত এই এক ব্যক্তি, সে আসিয়াই তারাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, তারা, তুই কি পাগল হয়েছিস্ না কি? তোর কি প্রাণ এতই ভারি হয়েছে যে এই জলে সে বোঝা নামাতে এসেছিস্।

তারা মাথা নাড়িল। সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ তাহার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল। তারার এ বিপদ সর্ব্বদাই ঘটিত। কেশগুচ্ছ সরাইয়া তারা আসিয়া উঠিল। সে হাসি সরল বালিকার। হাসিয়া কহিল, এতে পাগলামি কি দেখিলে? আমি ফুল তুলিয়া আনিতেছি, তোমরা দেখ। চেষ্টা করিলে সকলেই পারে। এই বলিয়া দ্রুতপদে বালুকাসৈকতে অবতরণ করিতে লাগিল।

যুবক ধাবিত হইয়া তারার হস্ত ধরিল, বলিল, তুই কি কথা বুঝিবি না? এ সব কি মেয়েমানুষের কাজ? যে সাহস পুরুষের শোভা পায় সে সাহসে মেয়েমানুষের কাজ কি?

বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অতি বেগে আপনার হস্ত মুক্ত করিল। এখন আর বালিকার আকৃতি নহে, এখন গর্ব্বিতা যুবতী। ধীর, মুক্ত স্বরে কহিল, "আমার কাজ নয়, তোমার কাজ ত? তুমি ত পুরুষ, তবে ফুল তুলিয়া আন না কেন?" আসন্ন ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে আকাশ আরও শান্ত হইল। চুলের আড়ালে চক্ষুযুগল বড় উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছিল। তারার মুখের উপর কেশগুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এবার আর সরান হইল না।

যুবক কোন উত্তর করিল না, এক পদ পশ্চাতে সরিল।

ঝড় বহিল। বালিকা অতি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া কহিল,

পুরুষ যেমন সাহস তেমন! নহিলে কি পুরুষে সাহসের পথে বাধা দেয়? তুমি যাও গিয়ে ভেলা বাঁধগে। দেখো যেন বাঁধন শক্ত হয়। তার পর ফুল তুলিও।

যুবকের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হইবে। তারার সহিত তাহার একদিনের পরিচয় মাত্র। শম্ভুজী তারার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিল, তাহার আচরণে তাহাকে নিতান্ত মূঢ়া বালিকা স্থির করিয়াছিল। সে ব্যাঘ্রীর কোমল করতল দেখিয়া তাহার সহিত খেলা করিতেছিল, এতক্ষণ নখর দেখিতে পায় নাই। এইবার তাহার হস্তে নখ বিদ্ধ হইল।

বালিকার কাছে এরূপ অপমানিত হইয়া শম্ভূজী একটা কিছু কঠোর উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কে বলিল, আর গোলে কাজ নাই। ঐ রঘুজী আসিতেছে।

সকলে সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। দীর্ঘ যষ্টি হস্তে একজন লোক গ্রাম হইতে হ্রদের দিকে আসিতেছিল। আকৃতি ঈষৎ খর্ব্ব, কিন্তু সেই বিশাল বক্ষ, দীর্ঘ, স্থূল, কঠিন বাহু অসুর বলের পরিচায়ক; ভ্রূযুগল মিলিত, অন্ধকার; ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল, কোটরনিবিষ্ট চক্ষু; ওষ্ঠাধর স্থূল, কর্কশ; শ্মশ্রু কঠিন, কুঞ্চিত, নিবিড়, কেশ অর্দ্ধপলিত, মূর্দ্ধ তাম্রবর্ণ, অযত্নে জটাবদ্ধ হইয়াছে। পথিক একাকী পথ চলিতে সে মূর্ত্তি দেখিলে, অর্থনাশ, প্রাণনাশের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়। পিতা কন্যাকে একত্র দেখিলে মনে হয় যেন কঠিন শিলাসম্ভূতা অমৃতসলিলা নির্ঝরিণী দেখিলাম।

রঘুজীকে আসিতে দেখিয়া সকলে একটু সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল। রঘুজী দেখিল সকলে মিলিয়া তাহার কন্যাকে ঘিরিয়াছে। সে তারাকে চিনিত। মিলিত ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, ললাট অন্ধকার করিয়া, কর্কশ, ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে?

একজন বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া উত্তর করিল, তোমার কন্যা বড় দুরন্ত। সে সাঁতারিয়া ঐ ফুল তুলিতে চাহে। আমরা এত করিয়া বারণ করিলাম, কিছুতে শোনেনা। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। এমন অসমসাহসিক কাজে কি এই বালিকার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত?

রঘুজী একবার সেই ইতস্ততঃ আন্দোলিত ফুল্ল কমল দেখিল, আর একবার তাহার কন্যার দিকে কটাক্ষ করিল। তখন তাহার অধরপ্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,

তুই ফুল তুলিতে পারিবি?

তারার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, আমি না পারি ডুবিয়া মরিব, সেও স্বীকার, কিন্তু আমি ফুল তুলিতে যাইব। আমি কি কখন এতটা সাঁতার দিই নাই?

রঘুজীর ললাট একটু পরিষ্কার হইল, কহিল, তবে যা!

এই আদেশ শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। প্রথম বক্তা কহিল, রঘুজী. তুমিও কি পাগল হইলে না কি? তোমার আর কেহ নাই, এই একটী সন্তান। তাহারও মরণের উপায় নিজে করিয়া দিতেছ? এতটা সাঁতার দিয়া কি ফিরিয়া আসিতে পারিবে? নিশ্চিত ডুবিবে।

বরষার মুহূর্ত্তমাত্র পরিষ্কার আকাশ আবার আঁধার হইল। রঘুজীর ললাট আকুঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় আরও ক্ষুদ্র হইয়া আরও উজ্জ্বল হইল। হস্তস্থিত যষ্টি বাম কক্ষে রাখিয়া, প্রসারিত বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া, বিপুল বৃষগ্রীবা উত্তোলন করিয়া, তীক্ষ্ণ, স্পষ্টস্বরে কহিল,

যাহা অপরের অসাধ্য, তাহা আমার অসাধ্য নহে। যাহা অপরের পুত্রের অসাধ্য তাহা আমার কন্যার পক্ষেও অসাধ্য নহে। আমার শোণিতে, আমার বংশে বল আছে। তারা আপনার ইচ্ছায় যাইতেছে, আমি তাহাকে

যাইতে বলি নাই। আপনার প্রাণের ভয়ে বা আপনার সন্তানের ভয়ে রঘুজী কখন সাহসের পথে বাধা দিয়াছে, এ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই। কেহ কখন বলিবে না।

সকলে চমৎকৃত, স্তম্ভিত হইল। সকলে নিরুত্তরে রহিল।

রঘুজীর কন্যাও শম্ভুজীকে এই কথা বলিয়াছিল।

তারা একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা অর্দ্ধস্ফুট পুলকের স্বরে মৃদু মৃদু তাহার চরণ চুম্বন করিতে লাগিল। উন্নত শরীর আরও উন্নত করিয়া তারা কটির বসন আরও আঁটিয়া বাঁধিল, তৎপরে অতিবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জলে পড়িল। অম্বুরাশি ঘোর কোলাহলে বিদারিত হইয়া ফেনময় উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া কূলে আহত হইল। সে ফেন, সে তরঙ্গ আবার ধীরে ধীরে মিশাইয়া গেল।

অনেক দূরে গিয়া বালিকা ভাসিয়া উঠিল। তখন, একবার মাথা নাড়িয়া, হংসীর মত দ্রুত সন্তরণ করিয়া চলিল। কুঞ্চিত, কৃষ্ণ, দীর্ঘ কেশভার সলিল-সংস্পর্শে ঋজু হইয়া, তরঙ্গের মৃদু মৃদু আন্দোলনে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বালিকা অবলীলাক্রমে দ্রুত সন্তরণ করিয়া চলিল। একবার কূলের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

কূলে দাঁড়াইয়া সকলেই দেখিতেছিল। বালক খেলা ভুলিয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে, প্রভাততপনালোকিত স্বর্ণশ্যাম জলে সেই অনাবৃত শ্বেত বাহুযুগলের অবিশ্রাম সঞ্চালন আর সেই কৃষ্ণকেশরাশির আন্দোলন দেখিতে-ছিল। স্নানকারী আর্দ্রবসনে তাহাই দেখিতেছিল, বস্ত্র তাহার অঙ্গেই শুকাইতেছিল। এক একজন এক একবার রঘুজীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল।

রঘুজীর নিকটে আর কেহ ছিল না, সে একাই দাঁড়াইয়া ছিল। দক্ষিণ হস্তে যষ্টির মধ্যভাগ ধারণ করিয়া, বামমুষ্টির মধ্যে যষ্টির অগ্রভাগ রাখিয়া, মুষ্টির উপরে চিবুক রাখিয়া, একদৃষ্টে সন্তরণমানা বালিকার প্রতি চাহিয়াছিল। ললাট, ভ্রূ, অতি ঘনকুঞ্চিত, চক্ষের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। সে চক্ষে স্নেহের লেশ মাত্র ছিল না।

তারা সাঁতারিয়া অনেক দূর গেল। অবশেষে ফুলের কাছে গেল। এক-বার হাত বাড়াইয়া আবার হাত টানিয়া লইল,—হাতে বুঝি কাঁটা ফুটিল!

আবার হাত বাড়াইল, এবারে ফুল ছিঁড়িল। ছিঁড়িয়া, সনাল, উৎফুল্ল, প্রস্ফুটিত রক্ত পদ্ম, মাথার উপরে ঘুরাইল। তীরস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিস্ময়ের অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, আবার সকলে ভাবিল,—ফিরিয়া আসিতে পারিবে কি?

তারা ফুল ছিঁড়িল দেখিয়া রঘুজী আর দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। গমনকালে তাহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল, আবার একটু পরে সে ললাটের চিরপরিচিত অন্ধকার ফিরিয়া আসিল।

বোধ হয় এই রঘুজীর অপত্যস্নেহ! চলিয়া গেল, বালিকা ডুবিবে কি বাঁচিবে একবার ভাবিল না। তারা যদি ডুবিয়া মরে ও তাহার পিতা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও হেলাইবে না কি? বালিকা মরিলে তাহার হত্যা কাহাকে লাগিবে?

ফুল ছিঁড়িয়া বালিকা কূলের অভিমুখে ফিরিল। এবার আর সে অন্ধকার কেশরাশি দেখা গেল না, কেবল সেই বহুদূরবর্ত্তী, দুর্নিরীক্ষ্য, সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর লোহিত তপনকিরণে জলবিন্দু মিশিয়া ঝলমল করিতে লাগিল। সন্তরণের তরে হস্তদ্বয় মুক্ত রাখিবার জন্য পদ্মমৃণাল দন্তে ধারণ করিল,—রাঙ্গামুখে রাঙ্গাফুল ফুটিল, কমলে কমল মিলিল!

তারা পাছে ডুবিয়া মরে, কি উপায়ে তাহাকে রক্ষা করা যাইতে পারে, কূলে দাঁড়াইয়া অনেকে সেই পরামর্শ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে শম্ভুজী প্রধান। তারাকে ফিরিতে দেখিয়া সে কহিল, যখন দেখিব তারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় লইয়া আসিব। এই বলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার দেখা দেখি আরও পাঁচ সাত জন জলে পড়িল।

শম্ভুজী সকলের আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। আর সকলে তাহার অনুবর্ত্তী হইল। অনেক দূরে গিয়া শম্ভুজী দেখিল, কমলমুখে জলদেবীর মত বালিকা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু হীনজ্যোতি, হস্তদ্বয় কষ্টে সঞ্চালিত হইতেছে। শম্ভুজী সাঁতারিয়া তাহার পাশে গেল, কহিল, তারা, ধন্য তোর বল! কিন্তু আর ত তুই পারিবি না। এখন না

ধরিলে ডুবিয়া যাইবি। আয় আমার হাতের উপর ভর দে, আমি তোকে কিনারায় লইয়া যাইতেছি।

তারার চক্ষু পূর্ব্বের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আবার তখনি নিভিয়া গেল। মুখের ফুল হাতে করিয়া কহিল,—সে স্বর পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণতর, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ,—কহিল,

তুমি আমায় বাঁচাইবে? লোকে বলিবে শম্ভুজী তারাকে রক্ষা করিয়াছে। আমি মরিলেও তোমার হাত ধরিব না, তোমাকে ছুঁইব না। তুমি আমাকে ধরিলেই ডুবিব। তুমিও মরিবে। আমার নিকটে আসিও না, সরিয়া যাও।

শম্ভুজী সরিয়া গেল। তারার পানে চাহিয়া দেখিল, এ এক নূতন রূপ। সে রূপ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল। দেখিল, মলিন মুখ, তবুও ভিতরে অনল জ্বলিতেছে। দেখিল, অতি স্বচ্ছ, শীতল, জ্যোতিহীন নয়নযুগলের মধ্যে, প্রজ্বলিত, তরল বিদ্যুৎবহ্নি প্রধাবিত হইতেছে। সে শীতলতা দেখিয়া শম্ভুজীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল, সে জ্বলন্ত অনল দেখিয়া শম্ভুজী পতঙ্গের সদৃশ অনিবার্য্য আকর্ষণে আকর্ষিত হইল।

শম্ভুজী সরিয়া গেল বটে, কিন্তু একেবারে ফিরিয়া আসিল না। মগ্নমান ব্যক্তি তৃণ পাইলেও তাহা অবলম্বন করে, তারা প্রাণের দায়ে কি শম্ভুজীর হাত ধরিবে না?

আর কেহ তারার নিকটে যাইতে সাহস করিল না।

তারা অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে কূলের নিকট আসিল। হাত পা অবশ হইয়া পড়িল, আর চলে না, একবার ভাবিল ডাঙ্গায় আসিয়া বুঝি ডুবিলাম। যন্ত্রণায় চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। এমন সময়ে পায়ে মাটী ঠেকিল। তারা দাঁড়াইতে পারে না, চক্ষে অন্ধকার দেখিল, কর্ণরন্ধ্রে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শুনিল, তাহার পরে আর কিছু শুনিল না, কিছু দেখিল না। বালিকা চেতনা হারাইল।

সে কিনারায় আসিয়াছিল। অর্দ্ধ অঙ্গ বালুকায় প্রোথিত হইল। কটি পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত রহিল। দৃঢ়নিমীলিত চক্ষে, মুখে, আর্দ্রকেশে বালুকা পূরিয়া গেল। আবিল, বালুকাময় তরঙ্গ বক্ষে লাগিল, আর একটা ঢেউ

আসিয়া সে বালুকা ধৌত করিয়া লইয়া গেল। বদনবিচ্যুত রক্তসরোজিনী জলে ভাসিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুজী গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার বাটীতে একজন ভৃত্য ও এক দাসী। ভৃত্যের নাম মহাদেব, দাসীর নাম কেহ জানে না, সকলে তাহাকে মায়ি বলিয়া ডাকে। রঘুজী তাহাদিগকে বলিল, তারা বুঝি ডুবিয়া মরে, তোরা দেখিতে চাস্ ত যা।

মহাদেব বৃদ্ধ, মায়ি বর্ষীয়সী। দুজনেই রঘুজীর কথা শুনিয়া একেবারে হ্রদের দিকে ছুটিল। ওঠে কি পড়ে সে জ্ঞান নাই।

তারা রঘুজীর কন্যা। রঘুজী কন্যাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্তে ফিরিয়া আসিল। এক ভৃত্য আর এক দাসী, তাহারা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে ছুটিল।

তাহারা দুজনে এত দৌড়িল কেন? তাহারা তারাকে মানুষ করিয়াছিল।

তারা আশৈশব মাতৃহারা।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে মায়ি কহিল, হায়, হায়, কোন দিন মেয়েটা অপঘাত মারা যাবে, আর আমি দেখিতে পাব না। এমন বাপের ঘরেও জন্মেছিল!

বলিতে বলিতে বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল। মহাদেব কহিল, এখন চুপ কর। মেয়েটা মরিল কি বাঁচিয়া আছে, আগে দেখি তার পর না হয় কাঁদিও।

দুজনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া দেখিল, তারা কিনারায় উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মায়ি জানু পাতিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

ফুলটি ভাসিয়া যায় দেখিয়া একটী বালক সেটী তুলিয়া মায়ির হাতে দিল।

শম্ভুজী জল হইতে উঠিয়া আসিয়া মায়ির পার্শ্বে দাঁড়াইল। আবার সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিতা বালিকাকে ঘিরিল।

মাঝি তারার মুদ্রিত চক্ষে হাত বুলাইয়া মহাদেবকে কহিল, এ যে অজ্ঞান হইয়াছে। ইহাকে বাড়ী লইয়া যাইব কেমন করিয়া ?

মহাদেব বলিয়া উঠিল, কেন, আমি লইয়া যাইব। তারাকে আমি বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, আর তাহাকে এইটুকু লইয়া যাইতে পারিব না ? তারা যে সে দিন পর্য্যন্ত আমার কাঁধে উঠিত।

মাঝি। তবে আর বিলম্ব করিওনা। ঘরে লইয়া চল।

শম্ভুজী পাশহইতে মহাদেবকে বলিল, আমি লইয়া যাইতেছি। আমি তোমার অপেক্ষা সবল আছি।

মহাদেব হস্তদ্বারা নিষেধ করিল। তাহার পর তারাকে দুই হাতে ধরিয়া তুলিল। তারার মস্তক মহাদেবের স্কন্ধে ঝুলিয়া পড়িল। লম্বিত কেশের মধ্যে বালুকাকণার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। মাঝি মহাদেবের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

শম্ভুজী ভাবিতেছিল, লজ্জার উপর লজ্জা পাইতেছি, পদে পদে অপ্রতিভ হইতেছি। না জানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম !

রঘুজী গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেতারা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেই গ্রামে রঘুজীর নিবাস। তাহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র। রঘুজী যৌবনকালেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। পুত্রের দুর্বৃত্ত চরিত্র দেখিয়া তাহার পিতা অকালেই কালমুখে পতিত হইলেন। রঘুজীর শৈশবাবস্থায়ই তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। গ্রামে রঘুজীর কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না।

দস্যু হইবার পূর্ব্বে রঘুজী বিবাহ করিয়াছিল। সে বিবাহের একটী মাত্র ফল,—তারা।

অনেক দিন পরে রঘুজী অকস্মাৎ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। বসতিবাটী ভগ্ন, পতিতাবস্থায় প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে। রঘুজী পুনর্ব্বার গৃহ নির্ম্মিত

করাইয়া, জমি ক্রয় করিয়া, লোক জন নিযুক্ত করিয়া বাস করিতে লাগিল। লোকে দেখিল, গ্রামের মধ্যে রঘুজীই ধনবান। গ্রামবাসীরা গরিব, তাহারা সর্ব্বদাই ধারকর্জ্জ করে। রঘুজী সুদে টাকা খাটাইতে আরম্ভ করিল।

কিছুদিন পরে রঘুজী তারাকে তাহার মাতুলালয় হইতে লইয়া আসিল। পূর্ব্বে তারা পিতার নিকটেই থাকিত, মায়ি ও মহাদেব তাহাকে লালনপালন করিত। কিছুদিন মাতুলালয়ে ছিল। তাহার সঙ্গে মায়ি আর মহাদেব সেতারায় আসিল। ইতিপূর্ব্বে তারা আর কখন সেতারায় আসে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ছোট গ্রামে একটা বড় গোলযোগ বাধিল। রঘুজীর কন্যার অদ্ভুত বলের ও সাহসের কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কেহ বা মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাস করিল। যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা কহিল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যাহারা দেখে নাই তাহারা কহিল, গুণ করিয়াছে। যে দেশের কথা বলিতেছি, সেখানে ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল ও অপরাপর কুহক এবং ভৌতিক বিদ্যায় বিশ্বাস বড় প্রবল। অনেকে, বিশেষতঃ যুবকেরা একবার তারাকে দেখিবার আশায় রঘুজীর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। দুঃখের বিষয় অনেকের সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না। গৃহের সম্মুখে জনতার কারণ জানিতে পারিয়া রঘুজী যষ্টিহস্তে ধাবমান হইল। তারাও কি মনে করিয়া কিছুদিন আর গৃহের বাহির হইত না।

জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। রঘুজীর কন্যা দর্শনের কৌতূহল ও সেতারা-গ্রামবাসীদের মনে চিরদিন রহিল না। দিন কতক পথে বাহির হইলে লোকে অঙ্গুলি দিয়া তারাকে দেখাইয়া দিত। কয়েক দিবস পরে তাহারও নিবৃত্তি হইল।

তারা সুন্দরী, এ কথা বলিয়াছি। যে সৌন্দর্য্য কোমলতাময়, যে সৌন্দর্য্য অপরিস্ফুট চম্পকের মত অর্দ্ধ স্ফুট, অর্দ্ধ অস্ফুট, এ সে সৌন্দর্য্য নয়। তারার রূপ প্রজাপতির পাখার রূপ নয়। তবু তারা অসামান্যা সুন্দরী। সে রূপ যে

দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। সুতরাং তাহার অনেক খেলিবার সঙ্গী জুটিত, কিন্তু তারা বড় একটা কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার উগ্রস্বভাব দেখিয়া অনেকে সরিয়া গেল।

কেবল একজন রহিল। শম্ভুজী রঘুজীর প্রতিবেশী। গৃহে কেবল তাহার মাতা ছিল। শম্ভুজী তারার আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে না পারিয়া, সে অনল হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল। এদিকে সে রঘুজীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই আনুগত্য ও অশেষ সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া, কর্কশ কথায়ও নিরুত্তর রহিয়া, সে ক্রমশঃ রঘুজীর নিকটে বড় আদর পাইতে আরম্ভ করিল।

শম্ভুজী বড় চতুর। সে যখন দেখিল যে তারা তাহার কথায় কর্ণপাত করে না, তখন মনে করিল রঘুজীকে হাত করিলে তাহার কন্যাকে পাইতে পারিব, সেই জন্য সে রঘুজীর মনস্তুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। আবার যখন দেখিল যে রঘুজীর বাটীতে রঘুজীর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কখনো কিছু হয় না, কেহ কখনো তাহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহস করে না, রঘুজী যাহা বলে তাহাই হয়, তখন তাহার মনে তারাকে পাইবার আশা আরও বলবতী হইল। সুবিধা পাইলে তারার কাছেও প্রণয়ের কথা পাড়িত।

রঘুজীর বাটীর পশ্চাতে বৃহৎ উদ্যান। উদ্যানে ফলের গাছেরই সংখ্যা অধিক, তারা আসিয়া দুই চারিটি ফুলের গাছ বসাইয়াছিল। একদিন বৈকালে তারা বাগানে বসিয়া ফুল গাছগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে, কোন গাছের শুষ্কপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, একটী গোলাপ গাছের পাতায় কীট প্রবেশ করিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই কীট বাহির করিতেছে। কুঞ্চিত কেশ তেমনই চক্ষের উপর আসিয়া পড়িতেছে, বামহস্তে সে কেশগুচ্ছ সরাইয়া আবার গাছের একটী শুষ্কশাখা ভাঙ্গিতেছে। একটী গোলাপ শুকাইয়া বৃন্তচ্যুত হইয়াছে, তারা সে বৃন্তটীও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। ফুলই যদি ঝরিল ত বৃন্তে কাজ কি? সুখই যদি হারাইলাম, তবে তাহার স্মৃতি থাকে কেন?

পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তারা একটু চমকিয়া উঠিল। হস্তে কণ্টক বিদ্ধ হইল। ফিরিয়া দেখিল, শম্ভুজী আসিতেছে। শম্ভুজী আসিয়া তারার কাছে

দাঁড়াইল। তারার হস্তে যে স্থলে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই ছিদ্রমুখে এক বিন্দু রক্ত বহিল। সে রক্তবিন্দু তৎক্ষণাৎ ধূলিতে মুছিয়া ফেলিল, অতএব শম্ভুজী তাহা দেখিতে পাইল না।

শম্ভুজী তারার নিকটে আসিয়া কহিল, তারা তোমার গাছগুলি যে বেশ হয়েছে।

একদিনের পরিচয়ে শম্ভুজী তারাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। ছয় মাসের আলাপে 'তুমি' বলিয়া কথা কহিতেছে।

ফুল তোলার পর শম্ভুজী তারাকে আর বালিকা বিবেচনা করিত না।

শম্ভুজীর কথা শুনিয়া তারা হাসিল না। তাহার সহিত আলাপে তারার আহ্লাদ হয় না, এ কথা শম্ভুজী জানিত, কিন্তু মনকে বুঝাইতে পারিত না। তারার কথা তাহার কর্ণে অতি মধুর শ্রুত হইত, তারাকে দেখিবার জন্য তাহার হৃদয় লালায়িত হইত। হৃদয়ের আকর্ষণ, মনকে বুঝাইলে বুঝিবে কেন?

আর এক কথা। শম্ভুজী ভাবিত, তারা আজ আমায় ভাল না বাসুক, দুদিন পরে ত বাসিতে পারে। সে দিন ফুল তুলিতে সাহস করি নাই বলিয়াই তারা আমার উপর অসন্তুষ্ট, কিন্তু সাহসের অপর পরিচয় পাইলে ত আবার আমাকে অন্যচক্ষে দেখিতে পারে। রঘুজী হয় ত এখনি তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহে সম্মত হইতে পারে, কিন্তু আর কিছুদিনে যদি তারার মত ফিরাইতে পারি, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। এই ভাবিয়া শম্ভুজী অপেক্ষা করিতেছিল।

অপর পক্ষে শম্ভুজীর উপরে তারার বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। আপনার হাত হইলে হয় ত শম্ভুজীকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিত না। কেবল পিতার ভয়ে তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিতে পারিত না। রঘুজীর কাছে তারা নিষ্ঠুর ব্যবহার ও নির্দ্দয় প্রহার ব্যতীত আর কোন আদর পায় নাই, এইজন্য সে রঘুজীকে ভাল না বাসুক ভয় করিত। যেখানে ভয় বাস করে, ভালবাসা সে দেশে প্রায় থাকে না। পিতার ভয়ে তারা চুপ করিয়া থাকিত, শম্ভুজীর সহিত কথাবার্ত্তাও কহিত।

শম্ভুজীর মুখে আপনার ফুল গাছের সুখ্যাতি শুনিয়া, তারা কহিল, কই না, গাছে বড় পোকা ধরিয়াছে, ফুল ভাল হয় না।

শম্ভুজী হাসিয়া একটী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ ছিঁড়িয়া কহিল, " এই যে বেশ ফুল ফুটিয়াছে। তুমি চুল বাঁধ না, নহিলে তোমার খোঁপায় পরা[illegible]দিতাম। তারা, এখন ত তুমি আর নিতান্ত ছেলে মানুষ নও, এখন আর তোমার পুরুষের মত কাপড় পরা ভাল দেখায় না। আর তুমি চুলের যে অযত্ন কর, তাহাতে তোমার চুলে কোনদিন জটা পড়িবে। এই যে জটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।" এই বলিয়া তারার মস্তকের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল।

তারা মাথা নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ভ্রুভঙ্গ করিল, আবার তখনি হাসিয়া উঠিল। কহিল,

আমার চুলে জটা পড়িলই বা ? আমি ঘোমটা টানিয়া, পায়ে কাপড় জড়াইয়া কি করিব ? আমি বেশ আছি, আমি বরাবর এমনি থাকিব।

শম্ভুজী। তারা, তোমার বিবাহের সময় হইয়াছে। দুদিন পরে তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিবেন। এ কথা স্মরণ করিও।

তারা একটু বিস্মিত, একটু ভীত হইল। চক্ষের উপর হইতে কেশ সরাইতে গিয়া ভ্রমক্রমে আরও চুল টানিয়া চোকের উপর ফেলিল। অনেক কষ্টে কেশরাশি যথাস্থানে সংরক্ষিত হইলে শম্ভুজী দেখিল, তারার চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঢল ঢল করিতেছে, প্রায় গণ্ড বহিয়া পড়ে। এক হাতে চুল টানিতে টানিতে তারা কহিতে লাগিল,

বিবাহ ? আমার আবার বিবাহ কেন ? আমি পিতাকে মিনতি করিব যেন আমার বিবাহ না দেন। আমি বিবাহ করিব না।

শম্ভুজী তারার প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া কাতর ভাবে কহিল, " তারা, আমার জন্য কি একবারও ভাব না ? আমি যে তোমার জন্য মরিতেছি, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ? তোমার পিতা আমাদের বিবাহে কখন আপত্তি করিবেন না। তোমার মন কি পাইব না ? বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না ? "

এই বলিয়া তাহার হাত ধরিল।

তারা হাত ছাড়াইয়া লইল। চক্ষের দুই বিন্দু জল চক্ষেই শুকাইল, গড়াইয়া পড়িল না। বাম হস্তে আর এক বিন্দু রক্ত বহিল, তাহাও ধূলিতে মুছিল।

শম্ভুজীর মুখে প্রণয়ের কথা তারা নূতন শুনে নাই। বিবাহের কথাই নূতন শুনিল। ইতিপূর্ব্বে শম্ভুজী বলিত, আমাকে ভালবাস। আমাকে ভালবাস না কেন? আমি তোমাকে ভাল বাসি, তুমি কেন আমাকে ভাল বাসিবে না? আজ সে বলিল, আমাকে বিবাহ কর। তাই তারা ভয় পাইল।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া তারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

তারার মৌনভাব দেখিয়া শম্ভুজী প্রোৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, আমাকে বাঁচাও, তারা। বল, আমাকে বিবাহ করিবে, নহিলে আমি মরিব। আমি যেমন তোমায় ভালবাসি, এমন আর কেহ কখন তোমাকে বাসিবে না। আমার কি অপরাধ দেখিলে, তারা? আমার দিকে চাহিবে না কি? বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?

তারা মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিতেছিল। এবার আর নিরুত্তরে রহিল না। নয়নপ্রান্তে, অধরপ্রান্তে, অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিল. শম্ভুজী তাহা দেখিতে পাইল না, দেখিলেও কিছু বুঝিতে পারিত না। সেই মৃদু হাসি অমৃতময় নয়, গরলময়। বজ্রপতনের পূর্ব্বে বিজলী ঝিলমিল। একটু হাসিয়া তারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,

বিবাহ হইলে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পূর্ণ বশে থাকিতে হয় ত? স্বামীর সকল আজ্ঞা পালন করিতে হয় ত?

বিস্ময়ের আতিশয্যে শম্ভুজী অবাক্ হইয়া রহিল, উত্তরে কেবল কহিল, হাঁ, এ কথা কেন?

তারা। না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আচ্ছা, স্বামীর শরীরে স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক বল থাকা উচিত ত?

শম্ভুজী হাঁ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, ভাল ছেলে মানুষের কাছে বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলাম। অবশেষে উত্তর করিল,

স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল। স্ত্রীলোকের বাহুতে বলের আবশ্যক কি? তাহাদের কটাক্ষেই কত বীর পরাজিত হয়।

তারা রসিকতাটা বুঝিল না, অথবা বুঝিবার চেষ্টা করিল না। কয়েক

পদ অন্তরে একটা বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ ছিল, তাহার একটা শাখা বৃক্ষমূল হইতে কিছু উচ্চে ঝুলিতেছিল। তারা গিয়া সেই ডাল ধরিল, তাহার পরে শম্ভুজীর দিকে ফিরিয়া কহিল,

আমি এই ডাল নোয়াইয়া ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া রাখিতেছি, তুমি এক দুই করিয়া দশ অবধি গণ।

বালিকা দুই হস্তে শাখা ধরিয়া সবলে নোয়াইয়া ধরিল। বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ধূলিধূসরিত হইল।

শম্ভুজী অবাক্, আরও অবাক্ হইয়া গণিতে আরম্ভ করিল, এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ,

বালিকা শাখাপরিত্যাগ করিল।

তৎপরে কহিল, তুমি এইবারে ধর, আমি পনর পর্য্যন্ত গণিতেছি।

এইবার শম্ভুজী বুঝিতে পারিল। তারার কথার উত্তর না করিয়া বিরক্ত-ভাবে কহিল, আমি তোমার সহিত আমাদের বিবাহের কথা কহিতে আসিলাম, আর তুমি ছেলেখেলা আরম্ভ করিলে?

তারা পূর্ব্বের মত মৃদু মৃদু কহিল, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত, আর আমার একটী সামান্য কথা রাখিতে পার না?

শম্ভুজী উপায়ান্তর না দেখিয়া, বৃক্ষতলে গিয়া ডাল ধরিল।

তারা কহিল, তুমি নোয়াইয়া ধর, আমি গণিতেছি।

শম্ভুজী প্রথমবারে ডাল নোয়াইতে পারিল না, পরে অনেক কষ্টে, নানাবিধ মুখভঙ্গী করিয়া, ডাল নোয়াইল।

তারা জোরে জোরে, স্পষ্টস্বরে গণিতে লাগিল, এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়,

শম্ভুজী আর ডাল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বৃক্ষশাখা হস্তমুক্ত হইয়া অতি বেগে উপরে উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে শম্ভুজীর নবীনশ্মশ্রুশোভিত মুখ ধূলি চুম্বিল।

তারা দেখিল, শম্ভুজী উঠিতে পারিতেছে না, অবশ্য কোথাও আঘাত লাগিয়া থাকিবে, অমনি তারার হাসি থামিয়া গেল, দ্রুতপদে তাহার পার্শ্বে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। ধীরে ধীরে তাহাকে তরুমূলে বসাইল।

শম্ভুজীর বড় অধিক লাগে নাই। চক্ষে মুখে ধূলা প্রবেশ করাতে ও দারুণ অপমানের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিল। আপনা আপনি উঠিয়া অধোবদনে গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল। তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, তারা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

শম্ভুজী, আমারই দোষে তোমার আঘাত লাগিয়াছে, এজন্য আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিতেছি। তোমার নিকটে আমার একটী অনুরোধ আছে। আর কখন বিবাহের কথা তুলিও না। আমি বোধ হয় কোন কালেই বিবাহ করিব না। তুমি যদি আমাকে ভাল বাস, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভাই বলিয়া জানিব। অন্য সম্বন্ধের প্রার্থী হইও না।

শম্ভুজী একটীও কথা কহিল না, আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

তারা বড় দুষ্ট। শম্ভুজী তাহার অপেক্ষা বলে ন্যূন হউক, ডাল নোয়াইয়া তারা তাহাকে বড় লজ্জা দিল। বৃক্ষশাখা অবনত করা যে তারার অভ্যস্ত, শম্ভুজী তাহা জানিত না।

সেই অবধি শম্ভুজী তারাকে কিছুই বলিত না। তারা নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া কখন কখন নিজে তাহার সহিত কথা কহিত। শম্ভুজী বিবাহের কোন কথা তুলিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেতারা হইতে ক্রোশ দুই অন্তরে ভীলপুর নামে আর একটী গ্রাম। ভীলপুর অপেক্ষাকৃত কিছু বড়। এই গ্রামে বৎসরান্তর একটা মেলা হয়। সেই উপলক্ষে নানাবিধ উৎসবাদি হইত। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে অনেক লোক মেলা দেখিতে সমবেত হইত। এই সময় সেই মেলা উপস্থিত হইল।

সেতারা এবং ভীলপুরের মধ্যে পর্ব্বতের কিয়দংশ আর একটা ক্ষুদ্র

জঙ্গল ব্যবধান। পর্ব্বতের পাদদেশ বেড়িয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। পথ দুর্গম নহে। এই সুবিধা পাইয়া গ্রামসুদ্ধ লোক মেলা দেখিতে আসিত।

তিন দিন করিয়া মেলা থাকে। মাঝের দিন বড় জাঁক। সেই দিন রঘুজী মেলা দেখিতে চলিল। শম্ভুজী কোন প্রয়োজনে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। দাস দাসীরাও সেই দিন ছুটী পাইল। তাহারা ভাল কাপড় পরিয়া, যথাসাধ্য অর্থ সঙ্গে লইয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে মেলা দেখিতে চলিল। রঘুজী তারাকে ডাকিয়া আপনার সঙ্গে লইল, আর তাহাকে বলিয়া রাখিল, যদি তুই বরাবর আমার কাছে না থাকিস্, ত তোর হাড় ভাঙ্গিব। অগত্যা তারা একটু মুখ বিকৃত করিয়া পিতার সমভিব্যাহারে চলিল।

সে দিন গ্রামে প্রায় কেহ রহিল না। গ্রাম প্রায় শূন্য হইল। কোন কুটীরের সম্মুখে কদাচিৎ জনেক চলৎশক্তিরহিত বৃদ্ধ, রৌদ্রে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে, কাসিতে কাসিতে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে আপনার যৌবনকালের ঘটনা সমূহ স্মরণ করিতেছে। কখনও বা, বাড়ীর সকলে চলিয়া গেল, তাহাকে কে তামাকু সাজিয়া দেয়, এই বলিয়া গালি পাড়িতেছে। ঘরের ভিতরে বুড়ী খট্টায় শয়িতাবস্থায়, পুত্রবধূ সাজিয়া গুজিয়া তামাসা দেখিতে গিয়াছে, এই কারণে তাহাকে নানাবিধ মধুর সম্বোধনে অভিহিত করিতেছে।

যাহারা মেলা দেখিতে চলিয়াছে, তাহাদের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। যুবকেরা লাঠি হাতে বাঁকা পাগড়ি বাঁধিয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা কেহ দাদার হাত ধরিয়া, কেহ মাতার হাত ধরিয়া মহা কুতূহলে চলিয়াছে। সকলের মুখেই হাসি, সকলেই মেলার গল্প করিতেছে। তরুণীকুল ললাটপ্রদেশ সিন্দুর ও তৈলে নিষিক্ত করিয়া মা শীতলার রূপে চলিয়াছেন। রাঙ্গা জমির উপর নানাবর্ণের চিত্র বিচিত্র করা চৌদ্দহাতি সাড়ী কুঞ্চিত করিয়া পরিধান; হাতে রাঙের কাঁকণ অথবা কাঁসার তাড়, পায়ে সেই বিষম গুরুভার কাঁসার মল। কেহবা অবসর মতে কজ্জলশোভিত নয়নের দুই চারিটা প্রাণঘাতী কটাক্ষ হানিতেছেন; কেহবা অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রতিবেশিনীর মল আপন চরণালঙ্কার অপেক্ষা ভারি কি না

অথবা তাহার গাড়ীর ফুলগুলি অধিকতর চাকচিক্যবিশিষ্ট কি না, তাহাই লক্ষ্য করিতেছেন।

সকলে সারি সারি চলিয়াছে। পর্ব্বত পশ্চাতে রাখিয়া সকলে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বনে অনেক জাতীয় গাছ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও বিটপীশ্রেণী বিরল। তাহারি মধ্য দিয়া মনুষ্যপদচিহ্নিত সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথে একে একে দর্শকদল চলিল।

কিছু দূর গিয়া তাহারা জঙ্গল পার হইল। তখন, নিদাঘের উত্তপ্ত দিবসে দ্বিপ্রহর সময়ে মধুমক্ষিকার গুন্ গুন্ রব যেমন কাননবিহারীর শ্রবণে মধুর শ্রুত হয়, দূর হইতে জনতাকোলাহল সেইরূপ মধুর হইয়া তাহাদের শ্রবণে পশিল। যুবকবৃন্দ দীর্ঘচরণবিক্ষেপে চলিল, বালকেরা যাহাদের হাত ধরিয়াছিল, তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। ইহা দেখিয়া সাথীরা, বালক বালিকার হাত চাপিয়া ধরিলেন, কেহ বা সন্তান কোলে করিয়া ছুটিলেন। যুবতীগণ লীলাগমন পরিহার পূর্ব্বক মল বাজাইয়া দ্রুতগমনে চলিলেন। সিন্দুর, তৈল এবং স্বেদবিন্দু একত্রে মিশিয়া, ললাট বহিয়া, নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দীর্ঘ পুণ্ড্ররূপে পরিশোভিত হইল।

মধুমক্ষিকাগুঞ্জন সাগরগর্জ্জনে পরিণত হইল। বিন্দু বিন্দু জলে বিশাল সমুদ্র হয়, একটী একটী মনুষ্য মিলিত হইয়া বিশাল মনুষ্যজলধি রচিত হইয়াছে। সমুদ্র কদাচ স্থির থাকে না, সেই মানবসমুদ্রও স্থির রহিল না। কখন এ দিকে কখন ও দিকে আলোড়িত, তরঙ্গিত, ক্ষুব্ধ হইতেছে। যে দিকে নূতন আমোদের বা কৌতূহলের বাতাস উঠিতেছে তরঙ্গদল সেই দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে। সে তরঙ্গ রোধ করে, কাহার সাধ্য? তরঙ্গমুখে যাহা পড়িতেছে তাহাই ভাসিয়া যাইতেছে। নিবাত নিস্তব্ধ সমুদ্রও যেমন একেবারে স্তব্ধ না হইয়া, পরিশ্রান্ত মহাকায় সজীব প্রাণীর তুল্য বক্ষঃস্ফীত ও সঙ্কুচিত করিতে থাকে, মানবসমুদ্রও সেইরূপ নিরন্তর বিচলিত হইতেছে। যে নূতন আসিতেছে সেই অপারসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ মিশাইয়া যাইতেছে। সেতারা হইতে যাহারা আসিল তাহারাও বিশালসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ মিশাইয়া গেল।

রঘুজীর বাহুতে বিপুল বল। সেই ভুজযুগল সঞ্চালিত করিয়া মনুষ্য-তরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। তারা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, নয়নে চঞ্চল জ্যোতি, অধরে কুটিল হাসি। দুই একজন ঠেলা খাইয়া রঘুজীর প্রতি ক্রোধকষায়িত লোচনে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আর কিছু কহিতে বা বলিতে সাহস হইল না। সে অঞ্চলে অনেকেই রঘুজীকে চিনিত, তাহাকে দেখিয়া অনেকে পথ ছাড়িয়া দিল।

চারিদিকে লোকারণ্য। পণ্যবীথিকায় বসিয়া বিক্রেতা চীৎকার করিয়া ক্রেতা ডাকিতেছে। অসাবধানতাপ্রযুক্ত কেহ একটা বালকের চরণ মর্দ্দিত করিয়া গিয়াছে; বালক মাতার হাত ধরিয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে ও দরং বিগলিত অশ্রুলোচনে সন্নিহিত মিষ্টান্নের দোকানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। মাতা, সন্তানের চরণমর্দ্দনকারীর উদ্দেশে উচ্চরবে গালি দিতেছেন। কোন রমণীর সাড়ীতে চরণধূলি লাগিয়াছে, যাঁহার চরণ, গালির ধমকে তিনি পালাইবার পথ পান না। বৰ্দ্ধিতনখ, শীর্ণকলেবর, বিভূতি-ভূষিত ঊর্দ্ধবাহু নিঃশব্দে ভিক্ষা যাচিতেছে, যবতী সম্মুখে পাইলে আরও চাপিয়া ধরিতেছে। এদিকে রমণীর লোল কটাক্ষ, ওদিকে তর্জ্জন গর্জ্জন আর মারামারি। এখানে ঐন্দ্রজালিকের কৌতুক প্রদর্শন; ওখানে মল্লের আস্ফোট ধ্বনি। কোথাও নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া বালকেরা ঘুরিতেছে, কোথাও কোন সুন্দরী কাচের কর্ণাভরণ ক্রয় করিয়া পুলকিত মনে বার বার তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন। একস্থানে মাটীর পুতুল বিক্রীত হইতেছে; কতকগুলি বালক অনিমেষ লোচনে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া খেলনা দেখিতেছে। কেহ চায় ঘোড়া, কেহ চায় মাটীর হাতী, কেহ চায় মাটীর মহাদেব। চারিদিকে ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি। সর্ব্বত্র কোলাহল আর সর্ব্বত্র ধূলা।

এক দিকে বড় ভিড়। রঘুজী তারাকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে গেল। সেখানে নানাবিধ ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে। দর্শকেরা তাহাতে বড় মনোযোগ না করিয়া যেন আর কিছুর অপেক্ষা করিতেছে। রঙ্গস্থলের বাহিরে একটা পর্কটী বৃক্ষ ছিল, তারা সেই বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পাশে একজন দীর্ঘকায় তরুণবয়স্ক যুবা অন্যমনে মৃদু মৃদু

গান করিতেছিল, তারা তাহাকে বড় লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই।

এমন সময়ে সেতারানিবাসী একজন যুবক সেই স্থলে উপস্থিত হইল, এবং তারাকে নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবককে কহিল, এই সেই তারা। দীর্ঘকায় যুবক এই কথা শ্রবণ করিয়া সাগ্রহে ও সমুৎসুকভাবে তারাকে ভাল করিয়া দেখিল।

তারার পরিধানে পূর্ব্বের মত পুরুষের বস্ত্রই ছিল। মস্তকে কোন আবরণ ছিল না।

আপনার নাম শুনিয়া তারা সবিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিল একজন অতি তরুণবয়স্ক, দীর্ঘাকৃতি, মনোহরকান্তি, যুবা পুরুষ, বামহস্তে সূর্য্যকিরণ আবৃত করিয়া সোৎসুক নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তেমন রূপ তারা কখন দেখে নাই। কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধে পড়িয়াছে; ললাট প্রশস্ত, নির্ম্মল; ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, তুলিচিত্রিত; চক্ষু দীর্ঘায়ত, কৃষ্ণতার, সমুজ্জ্বল, হাস্যপূর্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, সরল, উন্নত; ওষ্ঠাধর ভাস্করের শিক্ষাস্থল; মুখে অতি মধুর, অতি সরল হাসি; চিবুকে নবীন, কোমল শ্মশ্রু; দেবাকৃতি বীরাবয়ব। চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে তারা চক্ষু অবনত করিল; সরমে গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষে অভূতপূর্ব্ব মোহের আবেশ আসিল; তারা লজ্জায় অধোবদনে রহিল।

এতদিনে তারা বুঝিল, সে গর্ব্বিতপ্রকৃতি, কঠিনহৃদয়া বীরনারী নহে, অবশচিত্ত সামান্যা মানবী মাত্র।

এই সময়ে যুবককে কে ডাকিল, গোকুলজী, আর কেন বিলম্ব করিতেছ? তোমার জন্য এত লোকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখিতেছ না?

যুবক হাসিয়া রঙ্গভূমি মধ্যে প্রবেশ করিল।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তারা সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুলজী ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া রাখিল। তখন তাহার বর্ত্তুলাকার বাহুমূল, দৃঢ় মাংসপেশী, বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটি দর্শন করিয়া লোকে অস্ফুটস্বরে অনেক সুখ্যাতি করিল।

ভিড়ের ভিতরে শব্দ হইল, পথ ছাড়, অশ্ব আনিতেছে। আহত সলিল রাশি তুল্য দুই দিকে লোক সরিয়া গেল। ছয়জন লোকে দুইটা স্থূল রজ্জু

ধরিয়া, দীর্ঘকেশরযুক্ত, আচ্ছাদিতচক্ষু একটা অশ্ব রঙ্গস্থলে আনয়ন করিল। চক্ষু আবৃত বলিয়া অশ্ব স্থির ছিল; লোকে বুঝিল পার্ব্বতীয় অশ্ব,—এ পর্য্যন্ত বশীকৃত হয় নাই।

গোকুলজী অগ্রসর হইয়া অশ্বের কেশর মুষ্টিমধ্যে ধরিল। দর্শকেরা অনেক পশ্চাতে সরিয়া গেল, অতএব রঙ্গভূমির পরিসর বৰ্দ্ধিতায়তন হইল। রজ্জুধারীগণ রজ্জু উন্মোচন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তখন গোকুলজী স্বহস্তে অশ্বের চক্ষের আবরণ খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সেই মুহূর্ত্তে অশ্ব লম্ফ প্রদান করিয়া বেগে পলায়নের চেষ্টা পাইল।

গগনবিহারী শ্যেনপক্ষী দেখিলে কপোতকুল যেরূপ ভীত হয়, গোকুলজীর রিক্তহস্তে সেই ঘোটক দেখিয়া দর্শককুল সেইরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলে আত্মরক্ষায় যত্নবান রহিল, কিন্তু কেহ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল না। কৌতূহলের আকর্ষণ এমনি বলবৎ।

পর্কটীবৃক্ষে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া তারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যৎকালে ভীতির অস্ফুট শব্দ করিয়া আর সকলে ইতস্ততঃ করিতেছে, তারা শিলাখণ্ডবৎ অটল রহিল, কোন দিকে এক পদ সরিল না।

অনন্তর দর্শকমণ্ডলী অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। লোকালয়ের মানব বনের পশুকে, প্রভূত বলসম্পন্ন পর্ব্বতের অশ্বকে একা বাহুবলে বশীকৃত করিতেছে। অশ্ব কদাচ পৃষ্ঠে মনুষ্যভার বহে নাই, মনুষ্যের হস্ত অঙ্গস্পর্শ করিলে চমকিয়া উঠে; সম্মুখে বিপুল মানবসমুদ্র আর তাহার ভীতিবৰ্দ্ধন মনুষ্যের কোলাহল; ভয়ে সে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সাধ্যমত পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। গোকুলজী বজ্রমুষ্টিতে তাহার কেশর ধরিয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ! বিচিত্র প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়! মানবে আর অশ্বে বলের পরীক্ষা! মানুষের বুদ্ধি, কৌশল, চাতুরী, কিছু নাই; মাত্র বাহুবল। একবার অশ্ব গোকুলজীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আবার গোকুলজী সিংহবলে তাহাকে টানিয়া আনিতেছে। অশ্বক্ষুরে অন্ধকার ধূলিরাশি উড়িল।

উভয়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল। অশ্বের নাসারন্ধ্রে ফেন ছুটিল। গোকুলজী ধূলি এবং ঘর্ম্মে আপাদমস্তক কৰ্দ্দমাক্ত হইল। অবশেষে গোকুলজী অশ্বের কেশর পরিত্যাগ করিয়া তাহার নাসিকার উপরিভাগ চাপিয়া ধরিল। অশ্ব

তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোকুলজী বারবার অশ্বের স্কন্ধে করতাড়না করিল। তথাপি অশ্ব নিশ্চেষ্ট রহিল। অশ্ব বশীকরণ সমাধা হইল।

ধন্য বাহুবল!

মানবসমুদ্র মধ্যে সন্তোষসূচক মহাকোলাহল উঠিল। তারাবাই পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল।

গোকুলজী ললাটে স্বেদ মুছিতে মুছিতে রঙ্গস্থলের বাহিরে আসিল। অমনি একজন তাহাব হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, এদেশে গোকুলজীকে বলে আঁটে এমন কেহ নাই। রঘুজী পাশে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিল। কথাটা তাহাব বড়ই অসহ্য বোধ হইল। কর্কশ স্বরে চীৎকাব করিয়া কহিল, একটা বালককে লইয়া মিথ্যা বড়াই কেন? বালাজীর বেটা গোকুলজী, আমি তাহাকে জানি।

গোকুলজী হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বেদ মুছিতেছিল। সে রঘুজীকে চিনিত; তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, কি জান রঘুজী?

রঘুজী সেইরূপ কর্কশ স্বরে উত্তর করিল, আমি তোমার পিতাকে বিলক্ষণ জানি। তাহাব কত বল ছিল, তাহাও জানি। আজ তুমি একটা ঘোড়া ধরিয়া দিগ্বিজয়ী হইলে। কি বাপের বেটা রে!

গোকুলজী রঘুজীকে চিনিত বটে, কিন্তু তাহাকে ভয় করিত না। রঘুজীব কথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, দেখ, রঘুজী! আমার পিতা ইহলোকে নাই। তিনি থাকিলে আমাকে তোমার কথার উত্তব দিতে হইত না। আমাব পিতার কত বল ছিল, তাহা তুমি জান। যখন আর কেহ তোমাব বলে পারিত না, তখন তিনি তোমার সমকক্ষ ছিলেন, এ কথা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।

রঘুজী উত্তরে কটু করিয়া গালি দিল, কহিল. তোব বাপ যেমন মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক ছিল, তুইও সেইরূপ হইয়াছিস্।

মর্ম্মাহত সিংহের ন্যায় গোকুলজী লম্ফ দিয়া রঘুজীর গলদেশে হস্ত অর্পিত করিল, তৎপরে ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিল, রঘুজী, তোমার শুভ্রকেশ বলিয়াই আজ আমার হাতে রক্ষা পাইলে, নহিলে আমার পিতার নিন্দা বা

অপমান করিয়া তুমি অক্ষত শরীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিতে না।

গোকুলজী সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। রঘুজীর হাতে লাঠি ছিল। লাঠি ত্যাগ করিয়া কহিল, "বালক, পলিতকেশ হইলেও তোর অপেক্ষা হীনবল নহি।" এই বলিয়া তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিল। তখন দুইজনে হাতাহাতি আরম্ভ হইল।

অশ্ব বশীকরণের পর সকলে মনে করিয়াছিল, এখানে আর কিছু দেখিবার নাই, এই ভাবিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় নূতন ব্যাপারটা দেখিতে দাঁড়াইল। রঘুজীকে অনেকেই চিনিত, তাহার সামর্থ্য প্রচুর, এ কথাও অনেকে জানিত। এই কারণে অনেকে আরও কুতূহলী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেহ মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিল না।

গোকুলজী দীর্ঘাকৃত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তিপূর্ণ: রঘুজী খর্ব্বকায়, কঠিনগ্রন্থি, কিন্তু অসীম সামর্থ্যশালী। দুইজনে ক্রোধান্ধ; দুইজনে মহা বলবান; গোকুলজী পূর্ব্বপরিশ্রমে পরিক্লান্ত, রঘুজী অশ্রান্ত। প্রথমেই রঘুজী গোকুলকে দুই হস্তে ধরিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল। সে হস্তে মত্তহস্তীর বল। ব্যগ্রিতবল গোকুলজী স্রোতোমুখে বেতসীতুল্য অবনত হইয়া প্রায় ধরাশায়িত হইল। সেই সময় তাহার স্ফূর্ত্তি কাজে লাগিল। চরণদ্বয় ভূমিতে সবলে স্থাপিত করিয়া, জলে হস্তস্থিত মীনবৎ ঘুরিয়া রঘুজীর ভুজবন্ধন হইতে বাহির হইয়া গেল। রঘুজী চক্ষু পালটিতে দীর্ঘ বাহুদ্বারা গোকুলজী তাহার কটিদেশ বেষ্টিত করিল। একবার, দুইবার, তিনবার রঘুজী প্রবলবেগে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিল, তিনবার সে চেষ্টা বিফল হইল। যে বাহুতে অশ্ব বশীভূত হইয়াছিল, সে বাহুর বল সহজ নয়। রঘুজী অকষ্টবন্ধে পড়িল। গোকুলজী তাহার কটি আরও দৃঢ়রূপে ধরিল। তাহার পর তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল। সকলে দেখিল, রঘুজী বিপদে পড়িয়াছে, এইবার যদি গোকুলজী তাহাকে তুলিয়া ধরণীতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলেই তাহার পরাজয় হয়। গ্রামবাসী যেমন সভয়ে বহুপুরাতন, পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত, বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের উপর ভীম প্রভঞ্জনের দৌরাত্ম্য দেখে, প্রভঞ্জনবলে তরুশাখা মড়মড় করিতেছে, দুর্দ্দমনীয় আঘাতে প্রকাণ্ড তরু ধীরে ধীরে উন্মূলিত হইতেছে, দেখিয়া যেমন ভীত হয়, যে মুহূর্ত্তে উন্নত মস্তক তরুবর ভূমিশায়ী হইবে, সভয়ে সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা

করিতে থাকে, দর্শকশ্রেণীও সেইরূপ সভয়ে রঘুজীর যে মুহূর্ত্তে পরাজয় হইবে, সেই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তিনবার গোকুলজী রঘুজীকে শূন্যে তুলিবার উদ্যম করিল। তিনবার রঘুজী মৃত্তিকাপ্রোথিত প্রস্তরবৎ অটল রহিল। চতুর্থবার রঘুজী শূন্যে উঠিল। গোকুলজী তাহাকে মাথার উপরে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল, অপর মুহূর্ত্তে কি মনে করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে ধীরস্বরে কহিল, রঘুজী, তোমাকে বলে পরাজিত করিয়া অপমানিত করিলে, আমার পৌরুষ বাড়িবে না। আমাকে গালি দিতে হয় দিও, তোমায় আমি কিছু বলিব না, আমার পিতার অবমাননা সহ্য করিতে পারি না।

এইমাত্র বলিয়া গোকুলজী ধীর গমনে চলিয়া গেল।

পর্কটীবৃক্ষতলে চিত্রার্পিত মূর্ত্তিতুল্য তারা দাঁড়াইয়াছিল। গমনকালে গোকুলজী তাহাকে বলিয়া গেল, তোমার সাহসের ও বলের অদ্ভুত পরিচয় শুনিয়া তোমার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল। তোমার পিতার দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। এই বলিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। তারার সহিত গোকুলজী কথা কহিয়াছে, রঘুজী তাহা দেখিতে পাইল না।

রঘুজী বিনাবাক্যে লাঠি তুলিয়া লইয়া, চারিদিকে চাহিয়া তারাকে দেখিল, তাহার পর তাহাকে অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

জঙ্গলের পথে সে সময় অন্য পথিক ছিল না। রঘুজী আগে আগে তারা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। বনমধ্যে গাছে গাছে পক্ষীর কূজন শ্রুত হইতেছিল। বৃক্ষচ্ছায়া দীর্ঘ হইয়া পূর্ব্বদিকে হেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারা মাথা তুলিয়া গাছের পাতা, গাছের মাথা, তাহার উপরে সূর্য্যকিরণ, আর গাছের ডালে বিহঙ্গের পক্ষবিধূনন দেখিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার পর একটা বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া বলিল, আমি বাড়ী যাইব না।

রঘুজী ফিরিয়া চাহিল। সে অদ্যাবধি তারাকে কখন রোদন করিতে দেখে নাই। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কহিল, তুই কি পাগল হয়েছিস্ না কি? কাঁদিতেছিস্ কেন? উঠিয়া দাঁড়া।

তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। পুনরপি কাঁদিয়া কহিল, আমি বাড়ী যাইব না।

রঘুজী আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুই কাঁদিতেছিস্ কেন ?

তারা আর থাকিতে পারিল না। উন্মত্তার মত কহিল, তুমি অনর্থক সকলের সঙ্গে কেন অসদ্ভাব কর ? গোকুলজী তোমার কি করিয়াছিল, যে তুমি তাহার সহিত কলহ করিলে ?

অসহ্য অপমান রঘুজীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। বৈরসাধনের কোন উপায় ছিল না, এ কারণে অপমানানল আরও প্রজ্বলিতভাবে জ্বলিতেছিল। উত্তরে রঘুজী দুই হাতে লাঠি ধরিয়া ঘুরাইয়া তারার পৃষ্ঠে প্রহার করিল। ছিন্নক-দলীবৎ তারা ধরণীশায়িতা হইল। মেরুদণ্ড প্রায় ভগ্ন হইয়া গেল। তারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিল না, কোনও শব্দ করিল না। গতজীবন মানবদেহের তুল্য নিস্পন্দ রহিল।

রঘুজী তাহার পর তাহাকে লাথি মারিয়া উঠাইল, কহিল, বাড়ী যা। আবার এরূপ কথা শুনিলে তোকে প্রাণে বধ করিব।

তারা বিনাশব্দে, বাষ্পবিহীন চক্ষে, ধূলিধূসরিত অঙ্গে, মজ্জাগত যন্ত্রণায়, ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ী গেল। কাহাকেও কোন কথা বলিল না।

দুইটি মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই দিন অবধি তারা পুরুষের বেশ পরিত্যাগ করিল। সেই দিন অবধি পিতাকে পিতৃসম্বোধন রহিত করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রঘুজী ইহার কিছু জানিল না। তারাকে সে শৈশবাবধি প্রহার করিয়া আসিয়াছে। একদিন এক ঘা লাঠি খাইয়াই তারা পিতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে ? এ কথা শুনিলে রঘুজী হয়ত হাসিত। হয়ত আবার তারাকে প্রহার করিত।

কিছুদিন গেল। ইদানী রঘুজী তারাকে বড় একটা দুর্ব্বাক্য বলিত না, তাহার গায়ে হাত তুলিত না। এরূপ আচরণে অনেকে বিস্মিত হইল, মায়ি মনে করিল, হাজার হোক্, বাপ ত বটে। এখন মেয়ের বয়স হয়েচে, এখন কি আর মারা ধরা ভাল দেখায়? তাই আর কিছু বলে না।

তারা এখন তেমন চঞ্চল, তেমন দুরন্ত নাই। গৃহকর্ম্মে এখন বেশ মন। তাহার আর সে বেশ নাই, কুঞ্চিতকেশগুচ্ছ আর তেমন চক্ষের উপর পড়ে না। এখন তারা চুল বাঁধে। মায়ি পূর্ব্বে তারাকে কেবল বুঝাইত যে দুরন্ত হইতে নাই। কিন্তু তারাকে শান্তশিষ্ট দেখিয়া তাহার বড় ভাবনা হইল। তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া বলিত, আমি ত এখন আর ছেলেমানুষ নই।

শম্ভুজী রঘুজীর দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। সে তারার সহিত আর বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিত না। বিবাহের কথা রঘুজীকে বলাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তারাকে আর কিছু বলিত না।

তারা এক এক দিন পর্ব্বতে বেড়াইতে যায়, মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতে বড় ভাল বাসে।

একদিন তারা একাকিনী পর্ব্বতের উপরে অন্যমনে বেড়াইতেছিল। সময়টা বৈকালবেলা। গ্রামের লোকে বলিত পাহাড়ে কত রকম ভূতযোনি বাস করে। তারার সে সকল ভয় কিছুমাত্র ছিল না। একটা ঝরণায় ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া তারা জলে দুই পা ডুবাইয়া রহিয়াছে। আর একটু দূরে একটা গোরু জল খাইতেছে। ছোট ছোট গাছগুলি দেখিতে এমন সুন্দর! একটা হরিণ কোথা হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক তারার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। পলকের মধ্যে লম্ফের পর লম্ফ দিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া তারা দেখিল,—হরি! হরি! পর্ব্বতশিখর হইতে দীর্ঘকায় যুবক ধনুর্ব্বাণ হস্তে ক্ষিপ্রচরণে নামিয়া আসিতেছে! তারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার মনে করিল দৌড়িয়া পালাই। পালাইতে চাহিল, কিন্তু পা উঠিল না। কাজেই দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাপড়ের আঁচল টানিতে লাগিল।

ও তারা! এত লজ্জা হইল কবে, কাহাকেই বা এত লজ্জা?

দীর্ঘাকৃত পুরুষ তারার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে দেখিতে পাইয়া সচকিতে কহিয়া উঠিল, তারা, এখানে যে! বলিয়াই সলজ্জভাবে দশনে অধর চাপিল। তারার সহিত তাহার তেমন পরিচয় নাই, সে তারার নাম ধরিয়া ডাকিল কেন? আবার সে সহস্র লোকের সমক্ষে তারার পিতার অবমাননা করিয়াছে, সে কথা কি তারার স্মরণ নাই? তবে সে তারার সহিত কোন সাহসে কথা কয়?

দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। তারার আঁচল ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। মনে করিল, কি আপদ! আর কখন বাড়ীর বাহিরে যাইব না।

গোকুলজী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে এখানে?

আঃ! তারার যত উপদ্রব আঁচলের উপর। আঁচল ছিঁড়িলে কি হইবে?

শেষ বলিল, আমি কোন কোন দিন এখানে আসি। তুমি যে এখানে?

গোকুলজী। আমি সর্ব্বদা হরিণের চেষ্টায় আসি। আজ কিছু করিতে পারিলাম না। তোমার সম্মুখ দিয়া হরিণ পলাইয়া গেল।

তারা দেখিল আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল।

গোকুলজী মনে করিল, বোধ করি তারা আমার উপর অসন্তুষ্ট, তাই আর কিছু বলিতেছে না। এখন যাওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া বলিল, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।

তারা। তোমারও বাড়ী যাওয়া উচিত। বাড়ীতে তোমার স্ত্রী হয়ত তোমার জন্য ভাবিতেছে।

গোকুলজী বড় হাসিল, বলিল, "আমার আবার স্ত্রী কোথায়? ঘরে কেবল মা আছে, আর কেহ নাই। বুড়ী আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। আমি মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। কি করি পেট ত ভরা চাই।" বলিতে বলিতে গোকুলজীর দৃষ্টি, গোকুলজীর মুখের ভাব বড় কোমল হইয়া আসিল। তারা কটাক্ষে তাহা দেখিল। তাহার বুকের ভিতরে কি যেন একটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তবে আমি যাই।" বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি পাপ! এখনও পা ওঠেনা।

গোকুলজী বলিল, সে দিন তোমার পিতা মিছামিছি আমার সঙ্গে ঝগড়া

করিয়াছিলেন। আমার পিতার নামে মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া আমি রাগে অন্ধ হইয়াছিলাম। তোমার বাপকে আমি জানি। তিনি ইহজন্মে আর আমার মিত্র হইবেন না। তুমিও কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?

তারা তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, না, না, তোমার কোন অপরাধ ছিল না। আমি তোমার উপর কিছু রাগ করি নাই।

গোকুলজী তখন কহিতে লাগিল, ভীলপুরেই আমার নিবাস। তোমার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরিচয় ছিল। মহাদেব নামে আমাদের গ্রামের একজন লোক তোমার বাপের ভৃত্য ছিল, হয়ত এখনও আছে। সে আমাদের জানে।

তারা কিছু বলে না দেখিয়া গোকুলজী সস্মিতমুখে কহিল, পূর্ব্বে তোমার আর এক বেশ দেখিয়াছিলাম। সে বেশে তোমায় বড় সুন্দর দেখাইত।

বামহস্তের অঙ্গুলিতে অঞ্চল জড়াইতে জড়াইতে তারা উত্তর করিল, পুরুষের বেশ ধারণ করা স্ত্রীলোকের অনুচিত; আমি আর পুরুষের মত কাপড় পরিব না।

গোকুলজী অবশেষে বলিল, তোমার সঙ্গে একটু যাইব কি?

তারা কহিল, না। মনে মনে ভাবিল, একটু সঙ্গে আসিলে ক্ষতি কি?

পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

তারা ও গোকুলজী ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। তারা বাড়ী যাইতে পথে কেবল মনে মনে বলিতে লাগিল, ঘরে আর কেহ নাই, কেবল মা আছে। গোকুলজীর মা বই আর কেহ নাই। আর আমার, আমার কে আছে?

সেই রাত্রে তারা মহাদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মেলার দিন যে অশ্ব বশীকৃত করিয়াছিল, সে কে?

মহাদেব বুড়া হইয়াছিল, গল্প করিতে ভাল বাসিত। বলিল, সে কি? এতদিন আমি তোকে বলি নাই? গোকুলজীর ভীলপুরে নিবাস। আমারও সেই গ্রামে বাড়ী। গোকুলজীর বাপ বালাজী বড় সজ্জন ছিল, কিন্তু বড় গরিব। আগে অবস্থা ভাল ছিল। বালাজীর গায়ে বিলক্ষণ বল। এ অঞ্চলে রঘুজীর সঙ্গে সে ছাড়া আর কেহ পারিত না। শুনিয়াছি না কি একদিন রঘুজী তার সঙ্গে পারে নাই। বালাজীর উপর রঘুজীর বড় আক্রোশ। কিন্তু

বালাজী কখনো কাহারও অপকার করিত না। গোকুলজীর মত সুপুত্র আর নাই। মায়ের এমন সেবা করে যে শুনিলে চোখে জল আসে। আর তার সামর্থ্য তুই ত দেখেছিস্। তার উপর দেবতার কৃপা আছে। সে তোদের স্বজাতী রে! গোকুলজীর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে বেশ হয়। কনের মতন বর হয়।

তারা হাসিয়া উঠিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা রহিয়াছে, এমন সময় রঘুজী তাহাকে ডাকিল। তারা একবার মায়ির দিকে চাহিল, দৈন কটাক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে আমার বড় ডাক পড়িল? রঘুজী বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিয়াছে; ঘরখানি একতালা, সঙ্কীর্ণ, অনুচ্চদ্বার, একদিকে একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ। তারা ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই গবাক্ষে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে কেন ডাকিয়াছ?

রঘুজী দরজার দিকে চাহিয়াছিল। দরজার বাহিরে খানিক দূরে ঘাসের উপর বসিয়া দুইজন লোক দুইখানা পাথর হাতে লইয়া দুইটা কোদালে শান দিতেছে। তারার প্রশ্ন শুনিয়া রঘুজী ফিরিয়া চাহিল।

তারা আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে কেন ডাকিয়াছ?

রঘুজী বড় বিস্মিত হইল, তাহার পর বড় বিরক্ত হইল। তাহার কন্যা তাহাকে প্রশ্ন করে? বলিল, হাঁ আমি ডাকিয়াছি। কেন ডাকিয়াছি, তোর সে খোঁজে কাজ কি?

তারা কখন ভয়ে রঘুজীর মুখের দিকে চাহিতে পারে না। আজ সে

স্বচ্ছন্দে স্থির দৃষ্টিতে রঘুজীর দিকে চাহিয়া রহিল। একবার চক্ষু নত করিল না, একবার ঘাড় হেঁট করিল না, সভয়ে ইতস্ততঃ করিল না। দিব্য গবাক্ষের নিকট দেয়ালে পিঠ দিয়া, লম্বিত বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। আজ সে নিশ্চয় একটা কিছু মনে করিয়াছে।

তারা পূর্ব্বের মত বলিল, কেন ডাকিয়াছ বল, নহিলে আমি যাই।

রঘুজী ভ্রূকুটী করিয়া কহিল, চুপ করিয়া সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাক্। আমি তোকে কেন ডাকিয়াছি বলিব না।

তারা, "আচ্ছা," বলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রঘুজী রাগিয়া বলিল, দূর হইয়া যা!

তারা নিঃশব্দে চলিয়া যায়, রঘুজী আবার ধমক দিয়া দাঁড়াইতে বলিল। তারা দাঁড়াইয়া রহিল।

রঘুজীর রাগ বাড়িতে লাগিল। ইচ্ছা যে তাহাকে মারে, কিন্তু মারিবার কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তাহাকে কহিল, কেন তোকে ডাকিয়াছি জানিস্?

তারা। না।

রঘুজী। শম্ভুজী তোকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। তুই না কি বলিয়াছিস্ যে তাহাকে বিবাহ করিবি না?

তারা। হাঁ।

রঘুজী। তুই কি তাহাকে বিবাহ করিবি না?

তা। না।

র। তুই ভাবিয়াছিস্ যে তুই আপনার মতে বিবাহ করিবি, না? এক মাসের মধ্যে শম্ভুজীর সঙ্গে তোর বিবাহ দিব।

ত। আমি শম্ভুজীকে বিবাহ করিব না।

র। আমি বলিতেছি শম্ভুজীর সঙ্গে তোর বিবাহ দিব। আমার ইচ্ছার বিপরীত কখন কিছু হয়?

তা। আমার উপর আর তোমার ইচ্ছা চলিবে না। শম্ভুজীকে আমি কখন বিবাহ করিব না।

অন্যদিন হইলে এতক্ষণ রঘুজী তারাকে মারিত। আজ সে বড়ই বিস্মিত

হইয়াছিল। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল। বলিল, আমার অনেক টাকা আছে, জানিস্?

তা। জানি।

র। আমার কথা না শুনিলে তোকে আমি কিছু দিয়া যাইব না। তোকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমি আপন সম্পত্তি শম্ভুজীকে দিয়া যাইব।

তারা হাত কচলাইয়া সানন্দে বলিল, স্বচ্ছন্দে। তুমি শম্ভুজীকে সব দাও, আমি এক পয়সাও চাই না। আমায় ছাড়া শম্ভুজীকে সব দাও।

রঘুজীর হার হইল। আবার বলিল, তুই আমার খাইয়া মানুষ হইয়াছিস্। তোতে আমাতে সম্বন্ধ আছে।

এইবার তারার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মস্তক উত্তোলন করিয়া গর্ব্বিতস্বরে বলিল, তোমাতে আমাতে আবার সম্বন্ধ কি? তুমি আমাকে কেন মানুষ করিয়াছিলে? জীবনের ভার আমার গলায় কেন গাঁথিয়া দিয়াছিলে? এ বোঝা আমার বড় ভারি হইয়াছে। তুমি যে জীবন রক্ষা করিয়াছ সে জীবনে আমার কাজ কি? আমাকে তখনি মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমায় আমায় আবার সম্বন্ধ কি? কোন সম্বন্ধ নাই।

রঘুজীর মুখ বড় মলিন হইয়া গেল। সে বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, কি বলিলি আবার বল্ দেখি।

তারা কহিল, "যে দিন তুমি আমার পিঠে লাঠি মারিয়াছিলে, সেই দিন হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। তোমার সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ, আর ঐ পাহাড়ের সঙ্গেও আমার তেমনি সম্বন্ধ।" এই বলিয়া মুক্তগবাক্ষপথে হস্তপ্রসারিত করিল। সেখান হইতে পর্ব্বত দেখা যায়। তাহার পর বলিতে লাগিল, বরঞ্চ পাহাড়ের সঙ্গে আমার কিছু সম্বন্ধ আছে, তবু তোমার সহিত নাই।

রঘুজী লাফাইয়া তারার মুখে করাঘাত করিল। অপর মুহূর্ত্তে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বুকে পা দিয়া দাঁড়াইল। তারার বোধ হইল যেন বুকে পাথর দিয়া চাপিয়া ধরিতেছে। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইল। অস্থিপঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া গেল। শ্বাস রুদ্ধ, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পাছে যাতনায় চীৎকার করিতে হয়, এই কারণে তারা দন্তে দৃঢ়রূপে অধর

চাপিয়া ধরিল, তাহাতে অধর কাটিয়া রক্ত বহিল।

রঘুজীর মুখ নরকের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল, চক্ষে নরকানল জ্বলিতে-ছিল। কেবল দন্তে দন্ত ঘর্ষিত করিয়া বলিতে লাগিল, তবে নে, এই পাথর বুকে ধর্। মর্, মর্, আজ তোকে মারিয়া ফেলিব।

তারা একবার মাত্র বলিল, "মারিয়া ফেল। মরিলেই বাঁচি।" অনন্তর অধর চাপিয়া, অবিকৃত মুখে স্থিরনেত্রে রঘুজীর দিকে চাহিয়া রহিল। সে চক্ষে যন্ত্রণার লেশ মাত্র নাই, শুধু একান্ত ঘৃণা। সে ঘৃণার অচঞ্চল বিদ্যুতে রঘুজী চঞ্চল হইল।

পিতার বাৎসল্য নাই, মমতা নাই। সন্তানের ভক্তি নাই, পিতৃস্নেহ নাই; নিতান্ত স্বভাবের বিরোধী। এখন একজন পুরুষে আর এক রমণীতে বলের পরীক্ষা হইতেছে। পুরুষের হৃদয়ে হত্যার পাপ বাসনা বড় প্রবল; রমণীর হৃদয়ে অসীম ঘৃণা। দুইজনে কায়মনোবাক্যে দুইজনের শত্রু। উভয়ে প্রাণপণে উভয়কে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ে অনন্যচিত্ত। অতি ভীষণ দৃশ্য!

রঘুজী পা নামাইয়া লইল। বলিল, তোকে হত্যা করিয়া অনর্থক পাপ সংগ্রহ করিব না, ভরা ইতিপূর্ব্বেই ভারি হইয়াছে।

তারা অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। শেষে দুই হাতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঘুজীর সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। দুজনেই বুঝিল যে রঘুজীর হার হই-য়াছে। দুইজনে দীর্ঘকাল হিংস্র জন্তুর সদৃশ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পরে রঘুজী ধীরে ধীরে বলিল, আমার সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ নাই, বরং পাহাড়ের সঙ্গে আছে, বটে? তবে শোন্। তুই আমার বাড়ী ছেড়ে ঐ পাহাড়ে গিয়ে থাকিবি। সেখানে কেমন ঘর মিলে, একবার দেখে আয়। দু চার দিনে গোরু গুলা পাহাড়ের উপর চরাইবার জন্য নিয়ে যাবার কথা। আজকেই তুই সেই গোরুর সঙ্গে যাবি। পাহাড়ের উপর দুমাস গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ করিবি। পাহাড়ের নীচে আমার লোক থাকিবে। তোকে কখনো নামিতে দেখিলে আবার তোকে ধরিয়া

পাহাড়ের উপর রাখিয়া আসিবে। যখন শীত পড়িবে, পাহাড়ের উপর আর বড় ঘাস থাকিবে না, তখন গোরুগুলা সঙ্গে নিয়ে আসিবি। দেখি, তা হলে আমার কথা শুনিস্ কি না।

তারা উত্তরে বলিল, হানি কি? আমার এখন সর্ব্বত্র সমান। আজই পাহাড়ে যাইব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই নিদারুণ নির্ব্বাসনাজ্ঞা মুহূর্ত্তের মধ্যে রঘুজীর গৃহে প্রচারিত হইল। মায়ি ছুটিয়া একেবারে রঘুজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কত কাঁদিল, কত বুঝাইল, কত পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইল, বলিল, তোমার সেই সতী লক্ষ্মী স্ত্রীকে কত কষ্ট দিয়াছিলে, একবার মনে করিয়া দেখ। সেই স্ত্রীর একটী কন্যা, তাহাকে আজ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিতেছ। পাহাড়ের উপর গিয়া বাছা মরিয়া যাইবে। মাথার উপর দেবতা আছেন, রঘুজী, এমন কর্ম্ম করিও না। পাপের উপর আর পাপ চাপাইওনা। তারার মা স্বর্গে গিয়াছে, আর তাঁহার আত্মাকে কষ্ট দিও না।

রঘুজী কোন কথা শুনিল না। তখন বুড়ী রাগের মুখে তাহাকে গালি দিল। রঘুজী উঠিয়া তাহাকে লাথি মারিল। মায়ি ঘরের বাহিরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাদেব বকিতে বকিতে আসিতেছিল, রঘুজীর হাতে লাঠি দেখিয়া সরিয়া পড়িল। শম্ভুজী অনেক করিয়া বুঝাইল। রঘুজী কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। কহিল, পাহাড়ের সহিত সম্বন্ধ আছে, পাহাড়েই গিয়া থাকিবে। তারাও সকলকে নিষেধ করিল, বলিল, আমি পাহাড়ে বেশ থাকিব। গোরুর দুধ আর ফলমূল খাইয়া, পাহাড়ের উপর একটা ঘর বাঁধিয়া থাকিব। তোমরা কেহ রঘুজীকে অনুমত করিবার চেষ্টা করিওনা। আমার আর এখানে থাকিবার মন নাই।

মায়ি আর মহাদেব দেখিল, তারা এখন পিতাকে রঘুজী বলে, আর পিতা বলে না। তাহারা ভাবিল একটা বিশেষ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।

তারার পক্ষে দুটা কথা বলে এমন কেই বা ছিল? একটা চাকর, একটা দাসী, দুইজনে যাহা বলিবার তাহা বলিল, আর কাঁদিল, আর কি করিবে? শম্ভুজীর আধিপত্য যথেষ্ট, সেও অনেক চেষ্টা করিল, শেষে ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তারা যার নাড়ী ছেঁড়া ধন, সে ত আর ইহসংসারে নাই! তাবার কষ্ট দেখিলে যার বুক ফাটিয়া যায় সে ত আর নাই। অভাগী নির্ব্বাসিতা, এ কথা শুনিলে যে গৃহসংসারে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যাকে লইয়া আপনি নির্ব্বাসিতা হইত, সে জননী ত আব নাই। যাহার জননী আছে, তাহার আবার গৃহনির্ব্বাসন কি? মা কি সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? যেখানে মাতা সেই গৃহ, পিত্রালয় মাতুলালয় ত কথার কথা। যে মাতৃহারা সেই প্রকৃত নির্ব্বাসিত। সে মঙ্গলময় স্নেহরাজ্য হইতে যে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, সে ত পথের পথিক। পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত হইলে আর ত কেহ কোলে করিবা মাথায় হাত বুলাইয়া সে শ্রান্তি দূর করে না; আব ত কেহ তেমন বক্ষে লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে না। যাহার নিকটে থাকিলে মস্তকের উপর নীলাকাশ মাত্র আবরণ রহিলে, বোধ হয় গৃহের ভিতর আছি, সে ত আর নাই।

মাতাব মমতা কেমন, তাবা তাহা বুঝিতে না বুঝিতেই, মাতার মুখ হারাইয়া গেল। দুই পা চলিতে হইলে যখন চারিবার আছাড় খায়, থলমল করিয়া একটু চলে আবার আছাড় খায়, মুখে লাল আর ধুলা, আর রাঙ্গা মুখে চারিটী খুদে খুদে মুক্তার মত দাঁত, যখন আধ আধ করিয়া মা বলিয়া ডাকিত, হাসিতে হাসিতে লাল ফেলিতে ফেলিতে মার বুকে মুখ লুকাইত, সেই সময় মার মুখ হারাইয়া গেল। সে মুখের আলোক নিভিয়া গেল, কই, আর ত জ্বলিল না? সেই অবধি তারার অদৃষ্ট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মাতার মুখ ভুলিয়া তারা রঘুজীর অন্ধকার ললাট চিনিতে শিখিল। সে ললাটে স্নেহের কোমল কর কখনো স্পর্শে নাই, সে চক্ষে স্নেহের প্রশান্ত আলোক কখনো জ্বলে নাই। তারার জীবনাকাশে ঊষাকালে অরুণ উঠিতে না উঠিতেই মেঘ উঠিল, সে জীবন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর তারা গৃহত্যাগ করিল।

গোরুর পাল ছাড়া পাইলেই পর্ব্বতের দিকে যাইত, তাহাদের লইয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। চারিজন রাখাল ও চারিজন রঘুজীর বেতন-ভোগী তাহার আদেশক্রমে সেই সঙ্গে গেল, পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পঁহুছিলে তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

গ্রামে একটী সঙ্গতিশূন্য বৃদ্ধা তাহার এক মাত্র কন্যাকে লইয়া বাস করিত। কন্যাটীর নাম সোহিনী, তারার অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড়। সোহিনী কখন কখন রঘুজীর গৃহে কাজকর্ম্ম করিত; কখন ধান ভানিত, কখন ডাল ভাঙ্গিত, কখন ময়দা পিষিত। মায়ি গোপনে সোহিনী ও তাহার মাতার অনেক সাহায্য করিত। মহাদেব, রঘুজীর অজ্ঞাতসারে সোহিনীকে তারার সঙ্গে যাইতে বলিল, আর তাহাকে অনেক করিয়া বলিয়া দিল, অন্ততঃ দুই চারিদিন তারার সঙ্গে থাকিও।

তারার সঙ্গে আর কেহ যাইতে পাইল না, রঘুজীর নিষেধ ছিল। তারাও কাহাকে সঙ্গে লইতে অসম্মত হইল।

পর্ব্বতের যে অংশ দিয়া লোকের যাতায়াত ছিল, সে দিকে গোরু চরিবার মত তেমন ঘাস পাতা জন্মিত না। গোচারণের স্থান আর এক দিকে। রঘুজীর বেতনভুক্ত রাখালেরা সেইখানে গরু চরাইত। এবারেও সেই স্থলে গাভীর পাল লইয়া যাইবার আদেশ। পাহাড়ের নীচে লোক রাখিবার কথা রঘুজী তারাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল।

পাহাড়ে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তারার সঙ্গীরা সকলে ফিরিল, কেবল মাত্র সোহিনী রহিল।

জনপ্রাণীশূন্য দুর্গম স্থান। চারিদিকে পর্ব্বতশিখর। দূর্ব্বাদলবিমণ্ডিত অতি বিশাল স্তূপাকার শিলারাশি। একটা শৃঙ্গ আকাশের সহিত মিশাইয়া

গিয়াছে, আর একটা একদিকে হেলিয়া আছে। শিখরের উপরে গাছগুলি ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখাইতেছে। একটা প্রশস্ত উপত্যকা বাঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। পাখী উড়িয়া পাহাড়ের নীচে কুলায় যাইতেছে। আর সেই সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধতা অতি ভয়ানক!

তারা একটা ঝরণায় হাত পা ধুইয়া, অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিল। সোহিনীও তৃষ্ণায় কাতর। সেও তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া অঞ্চল খুলিয়া জলপান বাহির করিয়া তারাকে খাইতে বলিল। তারা তাহাকে হস্ত দ্বারা নিবারণ করিল।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া তারা দেখিল, স্থানটা অত্যন্ত শূন্য। গোরুগুলা এ দিক সে দিক চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের রোমন্থন শব্দ, কখন বা নীড়োন্মুখ একটা পক্ষীর চীৎকার, পর্ব্বত নির্ঝরের শব্দ কখন শ্রবণে পশে কখন পশে না, নচেৎ সেই উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে শব্দশূন্য।

তারা চক্ষু ফিরাইয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিল,—দেখিল সে হৃদয় বড় শূন্য। তবে শূন্যে শূন্যে মিশুক না কেন? উপরে সেই নিস্তব্ধ নীল শূন্য, চারিদিকে পাষাণময় হৃদয়বিহীন শূন্যতা, আর তারার সেই শূন্যময় হৃদয়, এই তিনে একত্রিত হইয়া মিশুক না কেন? সমানে সমান ত মিলিবার কথা। তারাও ভাবিতেছিল তাই। রঘুজীর গৃহে আমার স্থান হইল না, আমি তাহার গৃহে থাকিবার উপযুক্ত নহি। এইবার ত আমি আমার যথার্থ বাসস্থানে আসিয়াছি। এখানে আসা আমার পক্ষে আবার নির্ব্বাসন কি? এই ত আমার গৃহ। এই খানে আমার ঘর, এই পাহাড় আমার জনক জননী। আমার চক্ষে এ স্থান জনশূন্য নয়। যেমন আমার হৃদয়, তেমনি এই স্থান। কেন, এখানে থাকিলে আমার কষ্ট কি? আমি এখানে বেশ থাকিব।

“তা হইল কৈ, তারা? এ স্থান যে বড় শূন্য। তোমার শূন্য হৃদয় অপেক্ষাও শূন্য। দেখ দেখি, তোমার হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে কোথাও কি কিছু নাই? হৃদয় কি এতই শূন্য? এই বয়সেই কি সব ফুরাইল? তবে এ পর্ব্বতের সহিত তোমার হৃদয় একীভূত হয় না কেন?

কেন হইবে? কার হৃদয় এত নিস্তব্ধ, যে কোথাও কোন শব্দ শুনা

যায় না? তারা আশার কথা কাণে তত স্পষ্ট শুনিতে পায় না। আশা ত কখন কাহাকে ছাড়ে না। তারা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আশার মূর্ত্তি বড় ভাল দেখিতে পায় না। কাণ পাতিয়া শুনিল, আশার সে মধুর রাগিণী আর তেমন শুনিতে পায় না। সুতরাং তারা নিতান্ত সঙ্গীহারা হইল, চতুর্দ্দিক নিতান্ত শূন্যময় দেখিল। তবু হৃদয় একেবারে শূন্য নয়।

পথ চলিয়া তারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খানিকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে সেই কঠিন শয্যায় শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রিত হইল। যে শ্রান্ত, তাহার শয়নের জন্য সুখশয্যার আবশ্যক হয় না।

সোহিনী ভাবিতেছিল আর কিছু। স্থানটা এরূপ নির্জ্জন দেখিয়াই তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। গভীর নিস্তব্ধতা তাহার পক্ষে মহা কোলাহলময় হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে যেন নানাবিধ বিভীষিকা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সঙ্গে আবার কিছু কিছু সম্ভবপর ভয়ের কারণ তাহার স্মরণে আসিতে লাগিল। একবার ভাবিল, যদি রঘুজী তারার সহিত আমার এ স্থলে অবস্থানবার্ত্তা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহা হইলেই আমার সর্ব্বনাশ। প্রাণ রক্ষা হয় ত অন্নের উপায় ঘুচিবে। তাহার বাটীতে খাটিয়া খাই, তাহাও আর পাইব না। আবার এদিকে পাহাড়ে কত কি থাকে, ভর্ সন্ধ্যা বেলা পাহাড়ের উপর দুইটা মাত্র স্ত্রীলোক! নিকটে কেহ কোথাও নাই। কেন মরিতে আসিয়াছিলাম, আগে কেন ভাবি নাই?

সোহিনীর গা ছম্ ছম্ করিতেছে, এক একবার গায়ে কাঁটা দিতেছে, এমন সময়ে সে দেখিল যে তারা নিদ্রিতা।

সোহিনী একবার মনে করিল, চীৎকার করি, আবার তখনি ভাবিল, পালাই। তখনও তেমন অন্ধকার হয় নাই। যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা হয় ত এখনো বহুদূরে যায় নাই। সোহিনী আর দ্বিতীয় চিন্তা করিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া দুই চারি পা সাবধানে চলিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তারা নিদ্রিতাবস্থায় অতি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল।

শৈলশিখরে একজন মহাকায় পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছে। শরীর কৃষ্ণবর্ণ,

হস্তপদ দীর্ঘ, অতিশয় প্রশান্ত, অতিশয় গম্ভীর মূর্ত্তি। মস্তকে দীর্ঘ জটাজূট। চক্ষে পলক নাই, কটাক্ষ নাই। তারা চাহিয়া দেখিল, সে চক্ষু তুষারাবৃত! দেখিতে দেখিতে তারার হাত পা হিম হইয়া আসিল, বক্ষের ভিতরে যেন সেই শীতলতা প্রবেশ করিয়া, তাহার হৃদয়কে কম্পিত করিল। তারা সেই তুষারময় চক্ষু দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল।

জটাধারী পুরুষ তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিল। তারা উঠিয়া তাহার কাছে গেল। মহাকায় পুরুষ বলিল, তারা, তুই আজ হইতে আমার কন্যা হইলি। আমি এই পর্ব্বতের দেবতা। তোর পিতা তোকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এখন তুই আমার আশ্রয়ে থাক্। আমি তোকে কন্যা বলিলাম, তুই আমাকে পিতা বলিবি। আমার নিকটে থাকিবি?

শব্দ অতি গম্ভীর শ্রুত হইল। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশিখরশ্রেণী অবনত মস্তকে সে কথা শুনিতেছে। তারা মনে করিল, আকাশবাণী হইতেছে। উত্তর করিল, তোমার নিকটে থাকিব। আমার আর স্থান কোথায়?

অতিকায় পুরুষ দীর্ঘ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া তারাকে ধরিয়া ক্রোড়ে টানিয়া লইল।

সে ক্রোড়ের স্পর্শ নিতান্ত শীতল, রক্ত জমিয়া যায়। তারা অস্ফুট স্বরে কহিল, আমার বড় শীত বোধ হইতেছে।

নীহারচক্ষু পুরুষ সে কথা শুনিতে না পাইয়া, তারাকে কহিল, আমার আরও কন্যা আছে। চাহিয়া দেখ্।

তারা বিস্মিত হইয়া দেখিল, সাত জন যুবতী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাত জনই অপূর্ব্ব সুন্দরী, আলুলায়িতকেশা, সে কেশ চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সবই সুন্দর, কেবল নয়ন তুষারময়! সকলে মিলিয়া হাততালি দিয়া পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। একজন তারার হাত ধরিয়া তাহাকে সেই পুরুষের অঙ্কদেশ হইতে টানিয়া তুলিল। সকলে হাসিয়া কহিল, আমরা আর একটী ভগিনী পাইয়াছি। এই বলিয়া আবার ঘুরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি অপূর্ব্বরূপে তরঙ্গিত হইল।

একজন হাসিয়া তারার বেণী খুলিয়া দিল। আর একজন তাহার গলা

ধরিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তারা কাতরস্বরে কহিল, আমি শীতে মরি, আমাকে অঙ্গবস্ত্র দাও।

গলবেষ্টিতা সর্পিণীকে কেহ যেমন সত্বর পরিত্যাগ করে, সপ্তসুন্দরী সেইরূপ তারাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। সকলের অপেক্ষা যে প্রগল্‌ভা সে কহিল, আমরা পাষাণকন্যা, আমাদের আবার শীতগ্রীষ্ম কি? সর্ব্বনাশ! আমরা ভুজঙ্গিনীকে বক্ষে পুষিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এ যে মানবী, ইহাকে এখানে কেন আনিলে? ইহার হৃদয়ে যে এখনো পাপ পৃথিবীর বাসনা প্রবল রহিয়াছে। পিতঃ! ইহাকে দূর কর, দূর কর! নহিলে আমরা কলঙ্কিত হইব।

পাষাণ পুরুষ উত্তর করিল, ইহার হৃদয়ে যাহা আছে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দাও। তখন এ তোমাদের ভগিনী হইবার উপযুক্ত হইবে।

সপ্তযুবতী তুষারনয়নে তারার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল। তারার বোধ হইল যেন তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া সেই শীতল কটাক্ষ ছুটিতেছে। হৃদয়ের গভীরতম, অন্তরতম প্রদেশ সে দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রহিল না। তারা আপনার হৃদয়ের ভিতরে দেখিল, এ কি? অন্তরে, বাহিরে, এ কে? হৃদয়ের অতিশয় প্রচ্ছন্ন কন্দরে, আবার চক্ষের সম্মুখে, এ দীর্ঘকায়, মনোমোহন সুন্দর যুবাপুরুষ কে? তারা চমকিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে গোকুলজী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মহাকায় পুরুষ অতি গম্ভীর স্বরে কহিল, এই সকল অনর্থের মূল। ইহাকে শিখরশৃঙ্গ হইতে নীচে ফেলিয়া দাও।

সাত জনে গোকুলজীকে ধরিয়া শিখরশৃঙ্গে লইয়া চলিল, সেইখান হইতে তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিবে। কত সহস্র হস্ত নীচে পাষাণের উপর পড়িয়া তাহার অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইবে। গোকুলজী স্বয়ং নিশ্চেষ্ট, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা সদৃশ। নিস্পন্দ নয়নে কাতরদৃষ্টিতে তারার প্রতি চাহিয়া তাহাকে কটাক্ষে বলিতেছে, আমাকে রক্ষা কর। তুমি বিনা আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

তারা আজানুপ্রণত হইয়া, যুক্তকরে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মহাকায় পুরুষকে

সম্বোধন করিয়া কহিল, আমি তোমার নিকটে থাকিতে চাহিনা, তুমি গোকুলজীকে ছাড়িয়া দাও। আমি সংসারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে স্বীকৃত আছি, তুমি গোকুলজীকে ছাড়িয়া দাও। আমি এখনি গোকুলজীকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। তোমার পায়ে ধরি, তুমি গোকুলজীকে ছাড়িয়া দাও।

পাষাণপুরুষ কিছুই শুনিল না, কহিল, সংসারে তোর কপালে যন্ত্রণা বই আর কিছুই নাই। তুই সংসারের সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া এইখানে থাক্। গোকুলজীর দ্বারা তোর কেবল অমঙ্গল হইবে।

সপ্তরমণী মিলিত হইয়া গোকুলজীকে টানিয়া পর্ব্বতশিখরে লইয়া যাইতেছে। তারা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া গোকুলজীকে ধরিয়া তাহাকে ছিনিয়া লইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। পাষাণরমণীদের চক্ষে ঘৃণায় এবং ক্রোধে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। তুষারনয়নে অগ্নিকণা! তারা প্রাণপণে গোকুলজীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া একজন কহিল, ইহাকেও নীচে ফেলিয়া দাও।

তারা দেখিল, উভয়েরই প্রাণ যায়। প্রাণ ভয়ে তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

যামিনী অন্ধকার, কিন্তু আকাশ নির্ম্মল। আকাশে নক্ষত্র বায়ুবিচলিত প্রদীপের মত কম্পিত হইতেছে।

চক্ষু মুছিয়া তারা উঠিয়া বসিল। তখনো তাহার বক্ষের ভিতর গুর্ গুর্ করিতেছে। মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, সোহিনী! কেহ কোন উত্তর দিল না। উঠিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন তাহার ভীতিশূন্য হৃদয়েও একবার ভয়ের সঞ্চার হইল। উপত্যকাপথে কিছু দূর গিয়া অতি মুক্তকণ্ঠে ডাকিল, সোহিনী! সোহিনী! প্রতিধ্বনি ছুটিয়া নিমেষের মধ্যে পর্ব্বতের গহ্বরে গহ্বরে ডাকিল, সোহিনী! সোহিনী! উপত্যকায় ছুটিয়া নীচে গিয়া ডাকিল, সোহিনী! সোহিনী! পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, তাহার পর আকাশে উঠিয়া ক্ষীণতর স্বরে ডাকিল, সোহিনী! সোহিনী! তৎপরে দিগন্তে মিলাইয়া গেল। কেহ কোথাও কোন উত্তর দিল না, কেবল গোরুগুলা চর্ব্বিতচর্ব্বণ পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল চারিদিকে

চাহিয়া দেখিল, দুই একটা দুই একবার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া পূর্ব্বের মত স্থির ভাবে রোমন্থনে নিযুক্ত হইল।

এই সময়ে শৃগালে প্রহর ডাকিল।

সেই জনমানবশূন্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বতে তারা এখন একাকিনী। কিন্তু সে হৃদয় ভয়ে বিচলিত হইবার নহে। তারা বুঝিল, যে কারণেই হউক, মোহিনী তাহাকে একেলা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতেই এখন তাহাকে থাকিতে হইবে। আজ রাত্রে আর কোথায় যাইবে?

এই ভাবিয়া সেই তারকিত, নক্ষত্রখচিত, অনন্ত নীলাম্বর তলে শয়ন করিল। পথের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন, পুনরায় অবিলম্বে নিদ্রিত হইল। সমস্ত রাত্রি তারকারাজি সহস্র চক্ষু মেলিয়া পাষাণশয্যায় শয়িত সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভীলপুর গ্রামের এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটীর; সেই কুটীরে গোকুলজী ও তাহার জননী বাস করে। দুইটী ঘর, খড়ের চাল, তাহার উপরে খোলা। এক ঘরে গোকুলজী থাকে, আর এক ঘরে তাহার মাতা পাক করে, শয়ন করে। ঘরের একদিকে উনান পাতা, আর একদিকে একখানি সঙ্কীর্ণ চারপাই। সেই চারপাইয়ের উপর পরিষ্কার বিছানা। দেয়ালে বাঁশের চোঙ্গ করা তৈল রহিয়াছে। হাঁড়িতে চাল, ডাল, লবণ, ময়দা। মেজের উপর কিছু তরকারি। ঘরখানি দেখিলেই জানা যায় যে সে গরিবের বাসস্থান। ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখিলে ইহাও বোধ হয় যে, যাহারা সে ঘরে থাকে তাহারা প্রসন্নচিত্ত; আপনার

অদৃষ্টের নিন্দা করে না। গোকুলজীর ঘরে চারিদিকে মৃগয়ার উপকরণ; একটা শার্দ্দূলচর্ম্ম, খানকতক মৃগচর্ম্ম, ধনুক, শরপূর্ণ তূণ, বর্ষা, আরও কত কি রহিয়াছে। শয়নের নিমিত্ত একখানি চারপাই।

গোকুলজীর মাতা পাক করিতেছে; গোকুলজী গৃহদ্বারে বসিয়া একখণ্ড বর্ষাফলক মার্জ্জিত করিতেছে, সূর্য্যরশ্মি বর্ষাফলকে প্রতিফলিত হইতেছে। গোকুলজীর মাতা প্রাচীনা, শুভ্রকেশ স্কন্ধে ঝুলিতেছে, মাংস চর্ম্ম লোল, কিন্তু চক্ষের জ্যোতি হ্রাস হয় নাই, দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ। মাতাপুত্রে কথোপকথন হইতেছিল।

গোকুলজী বলিতেছে, মা, তুই এখন আর ভাল রাঁধিতে পারিস্‌নে। আমি এমন চমৎকার রাঁধিতে শিখিয়াছি। এইবার হইতে আমি পাক করিব।

বুড়ী একটু হাসিয়া কহিল, নে বাপু, তুই আর জ্বালাস্‌নে। আমি বুঝি তোর কথা বুঝিতে পারিনে? আমার রাঁধিলে পাছে কষ্ট হয়, তাই তুই একটা ফন্দী বার কোরে আপনি রাঁধিতে আরম্ভ করবি, না? তুই ত আমায় কোন কর্ম্মই করিতে দিস্‌নে। আমার বিছানা পর্য্যন্ত আপনি পাতিস্। আমার ত রাঁধিতে কোন কষ্ট হয় না, তবু তুই রোজ রোজ খোঁচাবি। দেখ্, শেষে আমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসেই মরে যাব।

গো। এখন আর মরিতে হয় না। এখন তোর কিসের বয়স? তোর পাকা চুল আবার কাল হবে এখন, দেখিস্।

মা। যদি সুসন্তানের সেবায় বেঁচে থাকিবার হত, তা হলে আমার এ সুখ কখনো ফুরাইত না। দশ ছেলে মেয়ে যা না করে, তুই আমার তাই করিতেছিস্। আর জন্মে না জানি কত পুণ্যই কোরেছিলেম, তাই তোর মত সন্তান পেটে ধরেছি। লোকে আমাদের দুঃখী বলে, কিন্তু আমার যত সুখ, এত সুখ মানুষের কপালে কদাচ ঘটে।

এই বলিয়া বুড়ী চক্ষু মুছিল।

গোকুলজী মাতার দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিয়াছিল। মাতার এই কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, দেখ্ মা, ও সব কথা বলিবি ত একটা বউ আনিয়া তোর গলায় গাঁথিয়া দিব। তখন সুখ টের পাবি।

মা। যদি বিয়ে করিস্, তা হলে ত ভালই হয়। বউ এসে আমার সেবা করিবে, আর আমিও বউয়ের মুখ দেখিয়া বত্তাই। তোর যেমন কথা, তুই কেবল বলিস্ যে বউ এলে আমার কষ্ট হবে। তা তুই ত বুঝেও বুঝ্‌বি না।

গো। আচ্ছা, মা, সে দিন মহাদেব যে তোর কাছে এসেছিল, সে তোকে কি বলিয়া গেল?

মা। ও কপাল, তুই বুঝি তাই ভাব্‌ছিলি? গোকুল, দেখ্, তুই বুঝি মনে করিস্ যে আমি বুড় হয়েছি, আর চোখে কিছু দেখ্‌তে পাই নে। ওরে, এখনও তেমন চোকের মাথা খাই নি। রঘুজীর মেয়েকে তুই বিয়ে কর্‌তে চাস্, কেমন? রঘুজীর মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে তোর ইচ্ছা হলেও, রঘুজী বিয়ে দেবে কি? আর দেখ্, আমি লোকের মুখে শুন্‌তে পাই যে মেয়েটা বড় দুরন্ত। রঘুজী না কি তাকে বাড়ীর বার্ করে দিয়েছে?

গোকুলজী কৃত্রিম কোপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, তুই যদি আমাকে মিছামিছি মন্দ কথা বল্‌বি, ত এখনি ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আর তোর পা টিপিয়া ভাঙ্গিয়া দিব। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মায়ের পদসেবা করিতে আরম্ভ করিল।

মাতা বিব্রত হইয়া গোকুলজীর হাত ধরিয়া বলিল, এমন ছেলে ত কোথাও দেখি নি। কোন কাজ কর্‌তে দেবে না, কেবল ব্যস্ত কোর্‌বে। সর্ বাছা, এখন সরে যা, আমি ভাতের হাঁড়ি নামাই।

গোকুলজী পা ছাড়িয়া মাথা ধরিল, বলিল, মা, তোর পাকা চুল তুলে দিই।

বুড়ী রাগিয়া কহিল, তুই ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ কর্‌লি। ভাত গলে পাঁক হয়ে যায়, আর তুই এলি পাকা চুল তুল্‌তে। এখন সরে যা। এই বলিয়া আবার চক্ষু মুছিল।

গোকুলজী তখন মার বিছানা ঝাড়িয়া আবার পাতিল। বুড়ী পানের সঙ্গে একটু করিয়া দোক্তা খায়, গোকুলজী দোক্তা দিয়া পান সাজিতে বসিল।

ভীলপুর গ্রামের একপ্রান্তে, ক্ষুদ্র কুটীরে, দরিদ্র বিধবা তাহার একমাত্র পুত্রকে লইয়া এইরূপে বাস করিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিস্তব্ধ বিজন পর্ব্বতোপরে অনাবৃত মস্তকে তারা নিদ্রাভিভূত ছিল। পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া গোদুগ্ধ পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল, তাহার পর পর্ব্বতজাত সুমিষ্ট সুপক্ক ফল আহরণ করিয়া ভোজনানন্তর ঝরণার শীতল জল পান করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, অন্য কথা ভাবিতে বসিল। মাথার উপরে আকাশ মাত্র চন্দ্রাতপ রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব। মাথা রাখিবার একটা স্থান চাই। এই মনে করিয়া তারা একটা মনোমত স্থান অন্বেষণ করিতে চলিল। এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইল, উপত্যকার পার্শ্বে একটা বৃহৎ গণ্ডশৈল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নিম্ন-ভাগ কতকটা একটা গহ্বরের মত, ডালপাতা জড় করিয়া সহজেই একটা কুটীর নির্ম্মাণ করা যায়। বিশেষ, সে স্থলে ঝড় বৃষ্টি কোনক্রমেই লাগিতে পারে না। তারা স্থির করিল, এই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিব।

কাজটাও বিশেষ অসাধ্য ব্যাপার নয়। পাহাড়ে গাছপালা বিস্তর, শুষ্কপর্ণ সংগ্রহ করিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া অনায়াসে কুটীর রচিত হয়। গহ্বরের মুখের কাছে কতকগুলা গাছের ডাল রাখিয়া খুঁটির কার্য্য চলে। সেই খুঁটিতে লতা পাতা জড়াইয়া গৃহপ্রাচীর নির্ম্মিত হইল। ভিতরে সেইরূপ একটা বেড়ার গৃহদ্বার, আর একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর অর্গল হইল। কুটীর বিরচিত হইলে তারার আর আনন্দের সীমা রহিল না। একবার কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখে, আবার দূর হইতে অনিমেষলোচনে দেখে, একবার এ পাশ দিয়া দেখে, আবার ও পাশ দিয়া দেখে, অবশেষ ভিতরে গিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল। দেখ, তারা কেমন ঘর বাঁধিয়াছে! এ তারার নিজের গৃহ, এখান হইতে কে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে? তারা হাসিয়াই আকুল। সে হাসি শুনিলে বুঝা যায় না যে তারা যুবতী, সে হাসি দেখিলে জানা যায় না তাহার কত দুঃখ। মনুষ্যের হৃদয়মন্দিরে দুঃখ সর্ব্বদা প্রবেশ

করিবার চেষ্টা করে। কতবার সে দ্বারে করাঘাত করে কেহ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কত রন্ধ্র অন্বেষণ করে, কোথাও প্রবেশপথ পায় না। কতবার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াও বাস করিতে পায় না। এমন কত দিনের পর সে হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহণ করে, আর কেহ তাহাকে সে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত তারার হৃদয়রাজ্য একেবারে দুঃখের হস্তগত হয় নাই। এমন স্থলে তারাকে একেলা পাইয়া দুঃখ আপন রাজ্য স্থাপন করিবার যত্ন করিতেছিল। বুঝি তারা তাহাকে হাসিয়া তাড়াইয়া দিল।

দুই মাস দীর্ঘকাল। মানুষ মানুষের আসঙ্গলিপ্সু। যেখানে মানুষের মুখ দেখিতে পায় না, সে স্থানে একদিন যাপন করা এক যুগ বলিয়া বোধ হয়। একে রমণী, তাহাতে যুবতী। অনেকাংশে অপ্রাকৃত তবু মানুষী। বিশেষ সে স্থান ভীতিসঙ্কুল। মনুষ্যমুখ দেখিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, মনুষ্যের জীবনঘাতী হিংস্র বন্যপশু দেখিবার অনেক সম্ভাবনা। জীবনরক্ষার কোন উপায় নাই। এমন স্থলে তারা দুইমাস কাটাইবে কিরূপে?

মানবজগতের আর এক মোহময় বন্ধনের গ্রন্থি তারার হৃদয়ে পড়িয়াছিল। সে বন্ধন,—প্রণয়ের। প্রথম প্রণয়, রমণীহৃদয়ের প্রণয়, অদম্য প্রকৃতির প্রণয়, শিলারুদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় তাহার হৃদয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ ছিল। পর্ব্বতে উঠিয়া প্রথম রজনীতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাতেও বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ স্থানে তারা সম্পূর্ণ একাকিনী। দুইমাস কাল অতীত না হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, ইহাও তাহার স্থির সঙ্কল্প।

এমন সঙ্কল্প কেন? তারা কি তাহার পিতার কথায় বাধ্য? তাহা নহে। গোকুলজী যে তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত, তাহার ত সে কোন প্রমাণ পায় নাই। আবার যে তাহাদের পরস্পরে কখন সাক্ষাৎ হইবে তাহাও সংশয় স্থল। তবে গোকুলজীর মূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিয়া কি হইবে? এই পর্ব্বত নিতান্ত নির্জ্জন। এইখানে গোকুলজীকে সহজে ভুলিতে পারিব। কোন সুখেই বা গৃহে ফিরিব? আমার গৃহই বা কোথায়? আর গোকুলজী?—গোকুলজী হইতে ত আমার কোন মঙ্গল হইবে না।" এই কথা

বলিতে বলিতে স্বপ্নদৃষ্ট তুষারচক্ষু পাষাণপুরুষ তাহার স্মরণে আসিল। সে শিহরিয়া উঠিল।

চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতপ্রাচীরপরিবেষ্টিত বৃহৎ কারাগার মধ্যে তারা বন্দিনী। পলাইলে কেহ তাহার গতি রোধ করিবে না, কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? মনুষ্যসমাজে কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? মানুষের আবাস স্থান যেন একটা সমুদ্র বিশেষ; অকরুণ তরঙ্গমালা তারাকে সে সমুদ্র হইতে ভাসাইয়া লইয়া, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে বহন করিয়া, অবশেষে এই শিলাময় উপকূলে নিক্ষেপ করিয়াছে।

গোকুলজীকে ভোলা দূরে থাকুক, তারার প্রণয় দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। বিরলে বসিয়া স্মৃতি ও কল্পনা একত্রে যোগ দিল। যোগ দিয়া তারার হৃদয়ে হৃদয়ে, শোণিতে শোণিতে, জাগ্রতে, স্বপ্নে গোকুলজীর মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিল। দিনমানে সূর্য্য, রাত্রে কখন নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্র কখন কেবল চঞ্চলজ্যোতি তারকারাশি। তারা কেবল তাহাই দেখিত। ভাবিত প্রভাত সূর্য্যের পশ্চাতে গোকুলজী আসিতেছে। চন্দ্রের সহিত সে মুখের তুলনা করিত, ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের পশ্চাতে গোকুলজীর জ্যোতির্ম্ময় আয়তলোচন দেখিতে পাইত। দ্রুতগামিনী ভয়চকিতলোচনা হরিণী দেখিলে মনে করিত পশ্চাতে ধনুর্দ্ধারী গোকুলজী আসিতেছে। মেঘে সহস্রবিধ মূর্ত্তি দেখিলেও কেবল মনে করিত গোকুলজীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি। তারার চিত্ত আর তাহার বশে নহে, প্রেমে তন্ময় হইয়া উঠিল।

প্রণয় দুই প্রকার। এক কল্পনা আর এক সম্ভোগ। আমি যাহাকে ভাল বাসি, সে আমার নিকটে আসিয়াছে, আমি তাহাকে স্পর্শ করিতেছি। আনন্দসাগর উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত হইতেছে। এই এক প্রকার প্রেম। আমি যাহাকে ভালবাসি সে আমার নিকটে নাই। কল্পনায় আমি তাহাকে সহস্ররূপ প্রণয়োপহার দিতেছি। হৃদয়ের কত রূপ আবেগ, স্মৃতির কৌশল-গ্রথিত ঘটনাবলী, কল্পনার উন্মাদকারিণী লহরী। অদর্শনের যন্ত্রণা, কুহকিনী কল্পনার প্রণোদনা। এই আর এক প্রেম। এক প্রেম বিরহ আর এক প্রেম মিলন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রঘুজীর গৃহে এখন শম্ভুজীই সর্ব্বেসর্ব্বা। তারার গৃহনির্ব্বাসনের পর সে ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। শম্ভুজীর তরেই তারা পর্ব্বতবাসিনী, এই কারণে মারি এবং মহাদেব উভয়েই তাহার উপর রুষ্ট। মারি একবার কথায় কথায় শম্ভুজীকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল। সেই অবধি শম্ভুজী তাহাদের উপর পীড়ন আরম্ভ করিল। রঘুজী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত শম্ভুজীর বশীভূত। তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনিলে শম্ভুজীকে কিছু বলা দূরে থাকুক, অভিযোগীকে মারিতে উদ্যত হইত। সংসারের সমুদায় ভার শম্ভুজীর উপর। যাহাকে ইচ্ছা রাখে, যাহাকে ইচ্ছা তাড়াইয়া দেয়। মহাদেবকে তাড়াইবার চেষ্টা করায় মহাদেব বলিয়াছিল, আমি এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাইব? তাড়াইয়া দাও, দ্বারের সম্মুখে অনাহারে মরিয়া থাকিব। এই শুনিয়া শম্ভুজী তাহাকে বহুশ্রমসাধ্য কর্ম্মে সর্ব্বদাই নিযুক্ত রাখিত। বলিত যে কাজ না করিলে খাইতে পাইবে না। এইরূপ আরও বহুবিধ অত্যাচারে সকলে সশঙ্কিত রহিত।

দুই মাস অতিবাহিত হইল। তারা পর্ব্বতপ্রবাস হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিল। গোরুর পাল আগেই গিয়া গোগৃহে প্রবেশ করিল।

পাহাড় হইতে রঘুজীর গৃহে আসিতে পথে সোহিনীর বাড়ী। সোহিনী অপরাহ্লকালে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় তারাকে দেখিতে পাইল। সোহিনী আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

তারার আর তেমন রূপ নাই। মাথায় জটা, গায় খড়ি উঠিতেছে। মলিন, ছিন্নবসনা, যোগিনীমূর্ত্তি। কিন্তু সে তীব্র চক্ষের দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল। সোহিনী তাহাকে দেখিয়া এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল। বলিল, আমি তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?

তারা হাসিয়া কহিল, না, আমি রাগ করি নাই। আমি সেখানে বেশ ছিলাম।

সো। তবে তুমি একবার আমার সঙ্গে এস। এখনি বাড়ী যেও না।

তারা। কেন?

সো। তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলিবার আছে। খানিকক্ষণ আমাদের ঘরে বস, তার পর বাড়ী যাইও।

তারা, সোহিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিল তাহার মনে কোন অমঙ্গল সংবাদ আছে, মুখে বলিতে পারিতেছে না। তখন সে সোহিনীর সঙ্গে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে?

সোহিনী উত্তর করিল, এত ব্যস্ত কেন? একটু বস, মুখে হাতে জল দাও, তার পর বলিব এখন।

তারা বিরক্ত হইয়া কহিল, কি বলিবার আছে, বল। নহিলে আমি চলিলাম।

সোহিনী। বলিতেছিলাম কি, তোমাদের বাড়ীতে অনেক নূতন কাণ্ড হইয়াছে। শম্ভুজীই এখন কর্ত্তা, যা ইচ্ছা তাই করে। সে এখন বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

তারা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, তা আমি জানি। আর কিছু আছে? আমাকে ডাকিলে কেন? এই কথা বলিবার জন্য?

সো। না, শুধু এই কথা নয়। আরও কথা আছে। সে মহাদেবকে বড় যন্ত্রণা দেয়। আর মায়িকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

তারার মুখের ভাবে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। পূর্ব্বের অপেক্ষা কিছু স্থিরভাবে কহিল, আর কি?

সো। তাহার পর মায়ির বড় ব্যারাম হইয়াছে, বাঁচে কি না সন্দেহ।

তারা দুই তিনবার স্থির দৃষ্টিতে সোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, মায়ি আর বাঁচিয়া নাই, সত্য বল?

সোহিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, হাঁ।

তারার স্বর কিছু মাত্র কম্পিত হইল না, পূর্ব্বের মত স্থির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—এবার কণ্ঠস্বর আরও ধীর আরও মৃদু,—সে কদিন মরিয়াছে?

সো। দিন পাঁচ ছয়।

তারা। কোথায়?

সে। আমাদের বাড়ীতে। শম্ভুজী তাহাকে তাড়াইয়া দিলে আমাদের বাড়ীতে দিন দশেক ছিল। ব্যারাম হইয়া আরও দশ দিন বাঁচিয়াছিল। সে সময় কেবল তোমার নাম করিত।

তারা আর কিছু না বলিয়া পিতৃ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সোহিনী মনে ভাবিল, ধন্য মেয়ে! শরীরে যদি কিছু মায়া থাকে! বুড়ী মার মত মানুষ কোরেছিল, তার জন্যে একবার কাঁদ্‌লে না গা, একবার আহা বল্‌লে না। বেশ কোরেছিল বাপ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন পাষাণপ্রাণ মেয়ের পাহাড়েই থাকা ভাল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে প্রবেশ করিতে তারা দেখিল, গৃহদ্বারে একটা স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। সে তারাকে ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তারা কিছু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটা কালো, চক্ষু দুটা লাল লাল, তারার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গসূচক অল্প হাস্য করিতেছিল। তারাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিল, আমাকে নতুন দেখ্‌চ, না? আমি নূতন এসেছি বটে, কিন্তু সব এখন আমার হাতে। তুমি বুঝি কর্ত্তার মেয়ে। তা আমি কি কর্‌ব বল? কর্ত্তা বলেচে যে যদি তুমি তার কথা শোন, তবেই বাড়ী ঢুক্‌তে পাবে। কি কথা তা আমি ভাল জানি না, কিন্তু আমায় আগে না বল্লে কর্ত্তা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে না। আর যদি তুমি এখনও আপনার গোঁ বজায় রাখ্‌তে চাও, ত তোমায় গোয়াল ঘরে শুতে হবে। এই বলিয়া মাগী একটু হাসিল।

বার তুই তারার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎ ছুটিল, শেষ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিল, তুই দাসী, তোর কিছু অপরাধ নাই। নহিলে তোর মুখ দিয়া রক্ত তুলিতাম। সরে যা! পথ ছাড়্!

দাসীর মূর্ত্তি ফিরিল। হাত নাড়িয়া চোক ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, জানি লো তোর বড় তেজ আছে। তেজ দ্যাখাতে হয়, তোর বাপকে দেখাগে যা। আমার কাছে কিসের তেজ দেখাস্ লা? আমি কি তোর খাই না তোর পরি যে তোকে ভয় কর্‌ব? বাপে ঠাঁই দেয় না ঘরে ছুঁড়ী এল আমার কাছে জোর দেখাতে! বের এখান থেকে। যা, গোয়ালঘরে যা!

তারা দন্তের উপর দন্ত রাখিয়া কহিল, ভাল চাস্ ত সরে যা। সরে যা বল্‌চি।

দাসী আর এক পা আগে আসিয়া কহিল, কিলা, মার্‌বি না কি? মার্ দেখি, তোর কত বড় সাধ্য?

তারা একবার বদ্ধমুষ্টি মারিবার হেতু উঠাইল, আবার তখনি হাত নামাইল।

দাসী তাড়াতাড়ি একটা চেলা কাঠ তুলিয়া লইয়া, সেইটা দক্ষিণ হস্তে আস্ফালন করিয়া কহিল, এক ঘা যদি মার্‌বি ত তোকে সাত ঘা মার্‌ব। আয় না একবার তোর পিঠে এই চেলা কাঠ বসিয়ে দিই, তখন সুখ টের পাবি।

তারা আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে ফিরিল। দাসী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

তারার হৃদয়ের ভিতর কি হইতেছিল, কে বলিবে? গৃহদ্বারে এইরূপে অপমানিত হইয়া, ঘুরিয়া বাড়ীর পশ্চাতে যে উদ্যান সেইখানে গেল। এইখানে তারা স্বহস্তে ফুলগাছ রোপন করিত। এইখানে শম্ভুজীকে মর্ম্ম-পীড়িত করিয়াছিল। এখন তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইতেছে।

উদ্যানে গিয়া তারা দেখিতে পাইল, মহাদেব কুঠার হস্তে কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। মহাদেব এখন আরও বৃদ্ধ, শীর্ণ, অবনতকায়, মরণাপন্ন। মহা-দেবকে দেখিয়া তারা কহিল, মহাদেব, তুমি যে কাঠ কাটিতেছ? এ ত তোমার কাজ নয়।

মহাদেব ফিরিয়া তারাকে দেখিল। দেখিয়া ললাটের স্বেদবিন্দু মুছিল। মুছিয়া বলিল, তারা এসেছিস্? তোকে যে আর দেখ্‌তে পাব সে আশা ছিল না। মাগ্নি মরেচে, বেঁচেছে। আমি এখন মরিলেই বাঁচি। এই বয়সে কপালে এত কষ্টও ছিল। এই বলিয়া বৃদ্ধ বালকের মত রোদন করিতে লাগিল।

তারা তাহার হাত হইতে কুঠার লইয়া ভূতলে রাখিল। তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া আম্রবৃক্ষতলে বসাইল। বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে, সব বল।

বৃদ্ধ কাঁদিয়া কহিল, ওই গুলি কাঠ না কাটিলে খাইতে পাইব না। আমায় ছেড়ে দে, আমি আগে কাঠ কাটি, তাহার পর বলিব। এখনি শম্ভুজী আসিবে। এই বলিয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

তারা বৃদ্ধের হাত চাপিয়া ধরিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তুমি কি সারাদিন অনাহারে আছ?

মহাদেব ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, কাঠ না কাটিলে রাত্রেও কিছু পাইব না, বরং প্রহারের জ্বালায় প্রাণ যাইবে। এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁপিতে লাগিল।

তারা বলিল, আমি যতক্ষণ আছি, তোমার কোন ভয় নাই। আমার সমক্ষে যদি কেহ তোমার গায়ে হাত দেয়, তাহাকে আমি ভাল করিয়া শিক্ষা দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার অপেক্ষা কর। এখনি খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিতেছি।

এই বলিয়া তারা পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল।

এবার তারা একেবারে রন্ধনশালায় গিয়া উপস্থিত। দ্বারে সেই দাসী বসিয়াছিল! তারাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি লা! আবার যে বড় এলি?

তারা জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার কোথায়?"

দাসী কটিদেশে দুই হস্ত রক্ষা করিয়া কহিল, খাবার এখানে কেন? তোকে সেই গোয়াল ঘরে খাবার দিয়ে আস্‌ব। এখানে এসেছিস্ কেন?

তারা আবার বলিল, আমার জন্য নয়। খাবার কোথায় আছে বল্।

দাসী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, হাসিয়া বলিল, নেকামি করিস্ কেন? নিজে পেটের জ্বালা দেখাতে বড় লজ্জা করে বুঝি?

এবার আর কিছু না বলিয়া তারা দাসীকে পদাঘাত করিল। দাসী মুখের ভরে পড়িয়া গেল। তারা গৃহে প্রবেশ করিয়া থালায় আহারদ্রব্য, ঘটি করিয়া জল লইয়া আবার উদ্যানে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল মহাদেব পূর্ব্বের মত কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। তারা আম্রতরুতলে থালা ঘটী রাখিয়া, পুনর্ব্বার মহাদেবের হস্ত হইতে কুঠার লইয়া তাহাকে খাইতে বলিল। মহাদেব অনশনে কাতর, দ্বিতীয় কথা না বলিয়া আহারে বসিয়া গেল। আহার করিতে করিতে বলিল, আজ সব কাঠ কাটা হইল না। না জানি অদৃষ্টে কত ভোগই আছে।

তারা কহিল, তোমার ভয় নাই, তুমি আহার করিয়া একটু বিশ্রাম কর। আমি তোমার কাঠ কাটিয়া রাখিতেছি।

তারা স্বয়ং ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা। মহাদেব তাহা জানে না, তারাও কিছু বলিল না।

যতক্ষণ মহাদেব আহার করিতেছিল, ততক্ষণ তারা তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। আহারান্তে তাহাকে বলিল, তুমি এইখানে একটু বস, আমি কাঠ কাটিয়া আনিতেছি।

মহাদেব অনেক দিন এমন বিশ্রামের অবকাশ পায় নাই। সে বসিয়া রহিল। তারা এক হাতে কাষ্ঠভার অপর হস্তে কুঠার লইয়া কিয়দ্দূর উদ্যানের ভিতর গিয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। কুঠারের এক এক আঘাতে কাষ্ঠ সমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কাঠুরিয়া সে হস্তের বল দেখিলে নিঃসন্দেহ বিস্মিত হইত।

সে পর্য্যন্ত তেমন অন্ধকার হয় নাই। তারা কাষ্ঠ ছেদন প্রায় সমাপ্ত করিয়াছে, এমন সময় কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। অনুমানে বুঝিল, মহাদেব আর্ত্তনাদ করিতেছে। কুঠার হস্তে তারা সেইদিকে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মহাদেব ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতেছে; শম্ভুজী বারম্বার তাহাকে নির্দ্দয় রূপে কষাঘাত করিতেছে, আর বলিতেছে, বড় বসিয়া বসিয়া আহার করিতিস্, না? এখনও কেবল বসিয়াই থাবি, কেমন?

আচ্ছা খা, এই খা, এই খা, এই খা, আরও খা। বৃদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে।

সহসা শম্ভুজী দেখিল, মস্তকে দীর্ঘ জটা, চক্ষে অতি ভয়ানক কোপ-কটাক্ষ, এক ভৈরবী বেগে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরবীর নয়নাগ্নি, তাড়িৎপ্রবাহের ন্যায় শম্ভুজীর চক্ষু ঝলসিত করিল। তারা আসিয়াই কহিল, নরাধম, এই খা! সন্ধ্যালোকে একবার শাণিত কুঠার চমকিল। সেই মুহূর্ত্তে শম্ভুজী হতচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রন্ধনগৃহদ্বারে মুখরা দাসী পদাহত হইয়া কিয়ৎকাল মুণ্ডের ভরে ভূপতিত রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রগড়াইয়া আরক্তবর্ণ করিল। তখন, ধীরে ধীরে উঠিয়া রঘুজীর ঘরে গেল। তাহার সম্মুখে কাঁদিয়া বলিল, আমি আর এখানে থাক্‌ব না। আমি চল্‌লাম।

রঘুজী পীড়িত, বাতরোগে শয্যাশায়িত। অস্থিগ্রন্থি সকল অবশ, অসাড়, বাতের বেদনায় অস্থির। দাসীকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কি হইয়াছে?

দাসী কহিল, তোমার সেই মেয়ে আজ আসিয়াই বিনাপরাধে আমাকে লাথি মারিয়াছে। আমি আর এখানে থাকিব না। এই বলিয়াই দাসী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

রঘুজী যন্ত্রণা সহকারে উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

তারা থালা হাতে করিয়া বাড়ীর পিছন দিকে গেল, দাসী তাহা দেখিয়াছিল। রঘুজীর কথায় উত্তর করিল, বোধ হয়, বাগানে আছে।

রঘুজী বলিল, তুই যা, আমি বাগানে যাইতেছি। তুই আমার আগে সেইখানে গিয়া তাহাকে দেখ্।

দাসী রঘুজীর ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া, দ্রুতগতি বাগানের দিকে চলিয়া গেল। রঘুজী লাঠি ধরিয়া অনেক কষ্টে পশ্চাতে আসিতেছিল।

দাসী উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, তারা শম্ভুজীর মস্তকে কুঠারাঘাত করিল ও শম্ভুজী রুধিরাক্ত কলেবরে ধরণীশয়ন করিল। এই দেখিয়াই দাসী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে বাবারে! খুন করেছে রে! তোমরা সব দৌড়ে এস গো! ওরে খুন কল্লে রে!

শম্ভুজী মুমূর্ষুর মত পড়িয়া গেল দেখিয়া তারার চৈতন্য হইল। কুঠার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যেখানে দাসী দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে গেল। তাহাকে দেখিয়া দাসী চীৎকার করিতে লাগিল, খুন করে পালিয়ে যাচ্চে গো! খুনে মাগীকে তোমরা ধর গো!

তারা ধীরে ধীরে দাসীকে কহিল, আমি পালাই নাই। তুই চীৎকার রাখিয়া শম্ভুজীকে দেখ্। সত্য সত্যই উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি কি না, আগে দেখ্। তাহার পর চীৎকার করিস্।

দাসী ভীতা হইয়া শম্ভুজীর নিকটে গেল। চীৎকারও বন্ধ হইল। তাহার সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

তারা স্থির গতিতে গৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দেখিল, যষ্টির উপর ভর করিয়া দ্বারের সম্মুখে রঘুজী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রঘুজী এখন ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, যন্ত্রণাকাতর, কিন্তু এ সময় ক্রোধে কাঁপিতেছে। মুখমণ্ডল অতি বিকট অন্ধকার।

নিকটেই আর একটা মুক্ত দ্বার দেখিয়া তারা সেই পথে ঘরে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। দাসীর চীৎকারে চারি পাঁচ জন লোক পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্র হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহারা রঘুজীর বেতনভুক্ত। দেখিতে দেখিতে আরও চারি পাঁচ জন লোক আসিয়া জুটিল। প্রাঙ্গণে লোক পূরিতে আরম্ভ হইল। রঘুজী আবার লাঠি ধরিয়া প্রাঙ্গণের নিকটে আসিয়া তারাকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইল। তারা স্থির, গম্ভীর, সম্পূর্ণ অবিচলিত।

শম্ভুজী মরে নাই। তারা কুঠারের শাণিতাগ্র দিয়া আঘাত করে নাই, তাহা হইলে শম্ভুজীর নিশ্চিত প্রাণবিনাশ হইত। কুঠারের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া প্রহার করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সেই আঘাতে শম্ভুজী মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। মস্তকাবরণ চর্ম্ম কাটিয়া যাওয়ায় রক্ত বহিতেছিল। অল্পকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্তি হইলে শম্ভুজী হস্তদ্বয়ের ভরে উঠিয়া বসিল। পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া, প্রাঙ্গণের উপরে যাইয়া দাঁড়াইল। দাসীও সেই সময় উঠিয়া গেল।

রঘুজী তারার দিকে চাহিয়া ভৃত্যদিগকে বলিল, উহাকে ধর।

তারা একবার তাহাদের দিকে কটাক্ষ করিল। তাহারা কেহ তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল না। তারা রঘুজীর দিকে ফিরিয়া কহিল, আমাকে ধরিতে হইবে না, সঙ্গে লোক থাকিলেই হইবে। আমায় কোথায় যাইতে হইবে বল, আমি আপনিই যাইতেছি।

রঘুজী। আমার বাড়ীতে আমিই বিচারকর্ত্তা। আমার নিকট অপরাধ করিয়া কেহ কখন অন্য বিচারালয়ে যায় নাই। আমার কন্যা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে? তোরা উহাকে ধর্, আমি বলিতেছি।

তারা গর্জ্জিয়া উঠিল, সাবধান, কেহ আমায় ধরিও না। তুমি আমার অপরাধের বিচার করিবে, রঘুজী? মনুষ্যহত্যা, স্ত্রীহত্যার পাতকী, মানবকুলকলঙ্ক, তুমি আমার বিচারকর্ত্তা? কাপুরুষ, দুর্ব্বলের পীড়ককে উচিত শাস্তি দিয়াছি, তুমি তাহার বিচার করিবে? রঘুজী, তোমার বিচার ঐখানে হইতেছে। এই বলিয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

সে ভীমা মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবার কাহারও সাধ্য রহিল না।

ক্রোধে রঘুজীর বাক্‌শক্তি রহিত হইবার উপক্রম হইল। রুদ্ধকণ্ঠে পার্শ্বস্থ একটা ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভীরু, একটা বালিকাকে ধরিতে পারিস্ না? আমি আপনিই ধরিতেছি। এই বলিয়া লাঠি ধরিয়া তারা যে দিকে দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে বহু কষ্টে অগ্রসর হইল।

তারা আর এক দিকে সরিয়া গেল। রঘুজী স্বয়ং আসিতেছে দেখিয়া দুইজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ সাহস করিয়া তারাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। তারা মাথা তুলিয়া, জটাভার আন্দোলিত করিয়া, চক্ষু হইতে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ

নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আমি কোথাও পালাই নাই। এখনও কেহ আমায় স্পর্শ করিও না। শম্ভুজীর দশা মনে রাখিও।" তাহারা নিরস্ত হইল।

রঘুজীর দিকে ফিরিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ধরিয়া কি করিবে?

রঘুজী বেদনায় অস্থির, আর চলিতে পারে না। যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থান হইতে উত্তর করিল, তোকে ধরিয়া বন্যপশুর মত একটা ঘরে পূরিয়া রাখিব। যতদিন তোর দর্প না চূর্ণ হয়, ততদিন তোকে মুক্ত করিব না।

তারার পক্ষে ইহাই অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। সে ভীত হইয়া কাতর স্বরে কহিল, আমার জন্য আর কোন শাস্তির বিধান কর, আমাকে প্রাণে বধ কর, কিন্তু আমাকে ঘরে বন্ধ করিও না। সে যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিব না।

রঘুজী অল্প ঈষৎ,—পিশাচে যদি ঈষৎ হাসিতে পারে, সেইরূপ—অল্প হাসিয়া কহিল, আমাকে তুই জানিস্। আমি তোকে আর কোন শাস্তি দিব না। অনুচরগণকে বলিল, উহাকে এখনি ধর্, নহিলে কাল তোদের সকলকে দূর করিয়া দিব।

এরূপ আজ্ঞা শুনিয়া সকলে তারাকে ধরিতে উদ্যত হইল। যে দুইজন প্রথমে তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল, তাহারা তারার দুই হস্ত ধারণ করিল।

গহন বনে শাবক রাখিয়া আহারান্বেষণে লোকালয়ে আগতা ব্যাঘ্রী অকস্মাৎ কারাবরুদ্ধ হইলে যেরূপ ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়, তারা রঘুজীর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সেইরূপ বিকলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিবার চিন্তিবার অবকাশ রহিল না। দুইজনে তাহার হস্ত ধরিল দেখিয়া সে অতি বেগে আপনার হস্ত আকর্ষণ করিল। একজন হস্তাকর্ষণের বেগে দূরে নিপতিত হইল, আর একজন দৃঢ়মুষ্টিতে তারার হাত ধরিয়া রহিল। মুক্তহস্তে তারা তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। সে তারার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার নাসিকা দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

নিমেষ মধ্যে তারা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া চুলী হইতে একখণ্ড

জ্বলন্ত ইন্ধন কাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘর হইতে বাহির হইল। হুতাশননয়না, হুতাশনহস্তা, রুদ্ররূপিনী রমণী দেখিয়া যে যেদিকে পাইল, পলায়ন করিল। বাটীর বাহিরে আসিয়া তারা দেখিল, রঘুজীর উত্তেজনায় অনেকে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। তারার শরীরে আর বড় বল নাই। এতলোকে পশ্চাদ্ধাবিত হইলে পলায়ন দুষ্কর। আর কোন উপায় না দেখিলে নিস্তার নাই।

তারা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে যে স্থানে দাঁড়াইল, সেখান হইতে অনুমান পঞ্চাশ হস্ত দূরে একটা বৃহৎ মরাই ছিল। তাহার উপরে আঁটি বাঁধা রাশীকৃত খড় থাকিত। তারা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া কহিল, আমাকে ধরিবে? তবে ধর! এই বলিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড ঘুরাইয়া মরাইয়ের উপর নিক্ষেপ করিল। খড় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

কি হইল! কি হইল! বলিয়া সকলে আগুন নিভাইতে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সেই অবকাশে তারাবাই, পিঞ্জরমুক্ত বনবাসিনী কুরঙ্গিণীর মত লঘুপদক্ষেপে পলায়ন করিল। আবার যে পর্ব্বতবাসিনী সেই পর্ব্বতবাসিনী হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হু—হু হু—হু বায়ু বহিল। পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া উপত্যকায় প্রধাবিত হইয়া, পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত তরুলতা প্রমথিত, তরুমূল উন্মূলিত করিয়া ভীষণ ঝটিকা গর্জ্জিতে লাগিল। বাত্যাবিতাড়িত রাশি রাশি উপলখণ্ড চট্ চট্ শব্দে প্রস্তরে প্রহত হইল। ঘূর্ণীবায়ু ধূলিস্তম্ভ তুলিয়া ক্ষিপ্তের মত ইতস্ততঃ আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণমেঘ ঝটিকামুখে ধাবিত হইয়া শিখরশৃঙ্গে জমিয়া বসিল। কাল মেঘের পর কাল মেঘ, দেখিতে দেখিতে

আকাশ বিচ্ছেদশূন্য কৃষ্ণজলদে সমাচ্ছন্ন হইল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, মসীময়। পর্ব্বতের উপরে তুমুল ঝটিকা। ধূলিরাশি বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে উঠিল। মেঘ, আকাশ হইতে নামিয়া ধূলির সহিত মিশিল। সঙ্কীর্ণসলিলা নির্ম্মল নির্ঝরিণীর জল আবিল হইয়া উঠিল। পর্ব্বতপ্রদেশের নিস্তব্ধতার সমাধি ভঙ্গ করিয়া ঝঞ্ঝা গর্জ্জিতে লাগিল।

গগনব্যাপী অন্ধকারময় মেঘের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘ বিদ্যুৎ চমকিল। তাহার পর মেঘগর্জ্জন। আবার গগনপ্রান্ত হইতে পর্ব্বতশিখরের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ হানিল। আবার অতি ভয়ঙ্কর রবে দীর্ঘকাল মেঘ মন্দ্রিত হইল। অদ্রিগুহায় সহস্র স্থলে সে গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইয়া, এ কন্দর হইতে অন্য কন্দরে, উপত্যকা হইতে অধিত্যকায় দ্বিগুণিত হইয়া গড়াইতে লাগিল। ভয়বিহ্বলা হরিণী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইল। কোন পশু ভীত হইয়া গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল, গুহাভ্যন্তরে ভৈরব শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল। কদাচিৎ কোন পক্ষীর কাতর চীৎকার ঝটিকাগর্জ্জনের মধ্যে শ্রুত হয়। মেঘগর্জ্জনের মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝাবায়ু আঘূর্ণিত হইয়া গর্জ্জিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে মাত্র। তথাপি পর্ব্বতের উপর অমাবস্যা রাত্রির মত অন্ধকার। উপত্যকায় সেই সময় দুইজন পথিক অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। একজন অশ্বপৃষ্ঠে আর একজন অশ্বের বল্গা ধরিয়া যাইতেছে, এমন সময় সহসা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া ঝটিকা বহিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ গর্জ্জিল। চক্ষে নাসিকায় মুখে ধূলা পুরিয়া যাওয়াতে তাহাদের নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। অন্ধকারে দিঙ্‌নিরূপণের উপায় রহিল না। অশ্ব যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহণে একটী রমণী ছিল। সে তাহার সঙ্গীকে মিনতি করিতেছিল, অশ্বের মুখরজ্জু ছাড়িয়া দিও না।

অকস্মাৎ ধূলিপূর্ণ ঘূর্ণীবায়ু তাহাদিগকে আবৃত করিলে, অশ্ব ভীত হইয়া সবেগে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিল। বলিষ্ঠ পুরুষ তাহাকে নিবৃত্ত করিল। রমণী ভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। সহসা সেই মানবশূন্য প্রদেশে মনুষ্যকণ্ঠে সেই চীৎকারের প্রতিশব্দ হইল! অশ্বমুখরজ্জুধারী পুরুষ মনে

করিলেন, এ শব্দ প্রতিধ্বনি মাত্র। তখনি আবার শুনিলেন, অদূরে ঝটিকা এবং মেঘের গর্জ্জন ভেদ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ মনুষ্যকণ্ঠ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিতেছে। পথিক তখন ভেরীনিনাদ তুল্য স্বরে ডাকিয়া কহিলেন, আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, এ ভয়াবহ স্থানে আর কোন মনুষ্য আছে কি?

এই সময় ধূলিরাশি অপসারিত হওয়াতে পথিক চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অশ্বারোহিণী অপহৃতচেতন হইয়া নিমীলিতচক্ষে অশ্বপৃষ্ঠে রহিয়াছেন। পাদচারী পুরুষ একহস্তে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়াছেন, আর একহস্তে অশ্বের মুখরজ্জ ধরিয়াছেন। রমণীর মস্তক তাঁহার স্কন্ধে রক্ষিত হইয়াছে। অশ্ব ভয়ে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথিক বড় বিপদে পড়িয়াছেন। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিয়দ্দূরে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পথিক বলিয়া উঠিলেন, মহাদেব! এ যে স্ত্রীলোক! মনে করিলেন, ইহাকে দিয়া উপকৃত হওয়া দূরে যাউক, ইহার বিপদ আমার অপেক্ষাও অধিক।

পথিক বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, রমণী স্থিরপদক্ষেপে দ্রুতগতি সেই অভিমুখে আসিতেছে। সমীপে আসিলে দুজনেই পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া চমকিয়া উঠিলেন। একজন মনে মনে বলিল, গোকুলজী! অপর ব্যক্তি অস্ফুট স্বরে কহিল, রঘুজীর কন্যা!

ইতিপূর্ব্বে তারাকে দেখিলে গোকুলজীর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। এখন সে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিল। তারা তাহা লক্ষ্য করিল।

গোকুলজী অনায়াসে বুঝিল যে তারা গৃহনির্ব্বাসিত হইয়া পর্ব্বতে কোন স্থানে বাস করে, ঘটনাক্রমে এই বিপত্তিকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। গোকুলজী, প্রথম বিস্ময়ের ভাব লুপ্ত হইলে কথঞ্চিৎ পরুষ স্বরে তারাকে কহিল, তোমা দ্বারা আমাদের কি সাহায্য হইবে? যে পিতৃগৃহে অগ্নিপ্রদান করে, তাহার নিকট উপকৃত হওয়ার চেয়ে মরণ ভাল।

তারার চক্ষের জ্যোতি নিভিয়া গেল, হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মনোভাব গোপন করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, বিপদের সময় কোন বিচার চলে না। আমি

অতি পাপিষ্ঠা হইলেও এ সময় আমাকে ঘৃণা করিও না। একবার এদিকে চাহিয়া দেখ। এই বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠস্থিতা রমণীকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইল। রমণী তখনও অচৈতন্য।

তারা মূর্চ্ছিতা যুবতীর প্রতি একবার অতি তীব্র কটাক্ষপাত করিল, তাহার পর তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, গোকুলজীকে কহিল, তুমি অশ্ব লইয়া আমার পশ্চাৎ আইস। আমার কুটীর অতি নিকটে।

তখনও প্রবলবেগে ঝটিকা গর্জ্জিতেছে। তারা যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া অনায়াসে কুটীর মুখে চলিল। গোকুলজী তাহার অদ্ভুত সামর্থ্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, বিধাতঃ! এমন শরীরে পাপের বাসস্থান কেন নির্দ্দেশ করিয়াছিলে?

কুটীরে প্রবেশ করিয়া তারা মূর্চ্ছিতা রমণীকে পর্ণশয্যায় শয়ন করাইল। তাহার পর তাহার চৈতন্যোৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুখে জলসিঞ্চনানন্তর মুখমণ্ডল নির্ম্মল হইলে তারা দেখিল যে সে বড় সুন্দরী। একবার ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল; তারা ভাবিল, আমার অপেক্ষা এ কোন অংশে সুন্দরী যে গোকুলজী ইহাকে বিবাহ করিল? আবার তখনি ভাবিল, আমার ত সে সব আশা ঘুচিয়াছে। গোকুলজী যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক না কেন, আমার তাতে কি?

তবু হৃদয় মানিল না। তারা মনকে কত বুঝাইল, তবু মন বুঝিল না। কত শতবার তারা গোকুলজীর মূর্ত্তি ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, শতবার সে মূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বলতর বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল। কতবার ভাবিত আমি পাথারে ভাসিয়াছি, কোথাও কূল কিনারা পাইব না, তবু আশার একটী তৃণ ছাড়িতে পারিত না। কতবার ভাবিত আমি মনুষ্যসমাজবহির্ভূত, মানুষ যে বন্ধনে আবদ্ধ হয় আমি তাহাতে বাঁধা পড়িব কেন? ইহাতে হৃদয়ে আরও কঠিন নিগড় পড়িল। পোড়া মন এমনি অবুঝ, যত বুঝাও তত আরও উল্‌টা বুঝিবে। যখন তারার প্রতীতি জন্মিল যে, এই যুবতী গোকুলজীর বিবাহিতা স্ত্রী, তখন তাহার হৃদয় বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত একেবারে শূন্য হইয়া উঠিল। বিষাদসাগরে ভাসমানা তরণী যেন অগাধ জলে নিমগ্ন হইল। কুটীরের বাহিরে ঝটিকাগর্জ্জন যেন দূরে মিশাইয়া

গেল। কুটীরদ্বারে গোকুলজীর মুখ ভাল লক্ষিত হয় না। সুপ্তচেতনা তরুণীর সুন্দর মুখ অন্ধকারে লুকাইল। তারা চতুর্দ্দিকে চক্ষু ফিরাইল। চক্ষে কেবল অন্ধকার দেখা যায়, আর কিছু না। তখন সে দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিল।

কতক্ষণ পরে মূর্চ্ছিতা রমণী চেতনা পাইয়া চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া সাতিশয় বিস্ময় সহকারে দেখিল সে এক ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কোমল শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিল তাহার পার্শ্বদেশে এক যোগিনী হস্তদ্বয়ের মধ্যে মুখ লুকায়িত করিয়া বসিয়া আছে। তৈলশূন্য জটাভার চারিদিকে পড়িয়াছে, পরিধেয় বসন ছিন্ন, গ্রন্থিবিশিষ্ট, নিতান্ত মলিন। যুবতী কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া মনে করিল, এ কে? আসন্ন বিপদ হইতে এই তপস্বিনী নিশ্চিত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া তাহার মুখ দেখিবার জন্য হস্তদ্বারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিল। বিজনবাসিনী সচকিত হইয়া হাত সরাইয়া লইল। দুইজনে পরস্পর চাহিয়া দেখিল, দুজনেই সুন্দরী। তারার চক্ষের জ্যোতি বড় প্রখর, কোমলচক্ষু কোমলপ্রকৃতি সুন্দরী সে চক্ষের সমক্ষে আপনার চক্ষু অবনত করিল।

গোকুলজী কুটীরের বাহিরে অশ্ব বন্ধন করিয়া কুটীরের দ্বারদেশে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, রমণী প্রকৃতিস্থ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন গৌরী, এখন কিছু ভাল বোধ হইতেছে?

গৌরী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কথা কহিবার শক্তি নাই। হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিল, ভাল আছি।

তারা মনোভাব গোপন করিয়া গৌরীকে বলিল, তুমি বড় কাহিল হইয়াছ; একটু দুগ্ধ গরম করিয়া দিতেছি, পান কর। তাহা হইলে শরীরে একটু বল পাইবে।

গোকুলজী কিছু বেগের সহিত শুষ্কভাবে কহিল, দুধ খাইবার কোন আবশ্যক নাই। আমরা এখনি যাইব।

তারা গোকুলজীর দিকে স্থিরদৃষ্টি ফিরাইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, নিতান্ত নির্দ্দয় হইলেও এমন অবস্থায় কেহ স্ত্রীলোককে পথ চলিতে বলে না। অসময়ে চণ্ডালের আতিথ্যও অস্বীকার করিতে নাই। সে এখনও কথা

কহিতে পারিতেছে না, তাহাকে এই পর্ব্বতের উপর দিয়া ঝড়বৃষ্টিতে লইয়া যাইতে কি তোমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না?

এই বলিয়া তারা দুধ গরম করিতে বসিল।

পাহাড়ের উপর দু চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়া আবার থামিয়া গেল। ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল।

গোকুলজী তারার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, কুটীরের বাহিরে যেখানে অশ্ব বাঁধা ছিল, সেইখানে চলিয়া গেল।

তারা অনেক সন্ধান করিয়া দু একটি মৃৎপাত্র জড় করিয়াছিল। একটী পাত্রে দুগ্ধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে অল্প অল্প করিয়া গৌরীকে পান করাইল। তাহার পর বাহিরে গিয়া গোকুলজীকে বলিল, কুটীরে কিছু ফলমূল আছে, আসিয়া আহার কর। আমার গৃহে আহার করিলে জাত যাইবে না।

গোকুলজী উত্তর করিল, আমার ক্ষুধা বোধ হয় নাই। আমি কিছু খাইব না।

তারা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে কি তোমার স্ত্রী?

গোকুলজী বিরক্তভাবে কহিল, সে কথায় তোমার কাজ কি? তারা কিছুমাত্র রাগ করিল না। আবার অতি করুণস্বরে কহিল, লোকে যাই বলুক, গোকুলজী, তুই আমাকে তত মন্দ মনে করিও না। তুমি ত ভিতরকার সব খবর জাননা।

গো। ভিতরকার খবর জানিবার আবশ্যক কি? তুমি কি শম্ভুজীকে খুন করিবার চেষ্টা কর নাই? শম্ভুজী হাজার দোষ করিলেও তোমার পাপের ভাগ ত কিছু কমিবে না? পিতৃগৃহে অগ্নি জ্বালাইয়া পলায়ন করিয়াছিলে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতক কিছু আছে? তোমার নিকটে উপকৃত না হইয়া যদি আমরা গিরিগহ্বরে পতিত হইতাম ত ভাল হইত।

তারার নয়নে অগ্নি জ্বলিল। সে প্রকৃতির অনবনমনীয় গর্ব্ব ফিরিয়া আসিল। উদ্ধতস্বরে কহিল, তুমি আমাকে মন্দ কথা বলিবার কে? আমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিব, সে জন্য তোমার কাছে দায়ী নহি

তুমি কি জানিবে, কেন আমি শম্ভূজীকে আঘাত করিয়াছিলাম, কেন আমি রঘুজীর গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলাম? তুমি আমাকে মন্দ কথা বলিবে কেন? তোমার কোন কথা আমি কেন সহ্য করিব?

গোকুলজী ভাবিল বাঘিনীর ঘরে আসিয়া তাহাকে ঘাঁটান ভাল নহে। এই ভাবিয়া নিরুত্তর হইল। তারার সম্বন্ধে তাহার যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা আরও দৃঢ় হইল।

তারা কুটীরে ফিরিয়া গেল। অভিমানানল নির্ব্বাপিত হইল। কুটীরে গিয়া দেখিল, গৌরী উঠিয়া বসিয়াছে। তারা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যিনি তোমার সঙ্গে আছেন, উনি কি তোমার স্বামী?

গৌরী একটু খানি দুষ্ট হাসি হাসিয়া, চোক ঘুরাইয়া, তারার পানে আড়নয়নে কটাক্ষ করিয়া কহিল, না।

তারা। তবে কি উনি তোমায় বিবাহ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন?

গৌরী। না।

তারা। কিছু দিন পরে তোমাদের বিবাহ হইবে?

গৌরী। না।

তবে ——এই বলিয়াই তারা চুপ করিল।

গৌরী বুঝিয়া কিছু গম্ভীরভাবে কহিল, আমি তোমার কথা বুঝিয়াছি। তবে আমি পরপুরুষের সঙ্গে কেন একাকিনী এমন পথ দিয়া যাইতেছি, তুমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাও। এই কথাটীর উত্তর দিতে পারিব না। নিষেধ আছে। তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

তারা কিছু চিন্তিতা হইল, কিছু ভাল বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কহিল, আজ রাত্রি তোমরা এই খানেই থাক, কাল প্রাতে যাইও।

গৌরী হাসিয়া বলিল, ক্ষতি কি। তুমি আমাকে যে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, তাহা কখন শুধিতে পারিব না। তা না হয় তোমার আশ্রয়ে একটা রাত থাকিলাম। সে ত ভালই।

এই সময় গোকুলজী পুনরায় কুটীরদ্বারের সম্মুখে আসিল। তারা তাহাকে দেখিয়া বলিল, আজ তোমরা এইখানে থাক। কাল না হয়

যাইও। এখনও কি হয় বলা যায় না।

বৃষ্টি আদৌ অধিক পড়ে নাই। ঝটিকার বেগ অনেক পরিমাণে শমিত হইয়াছিল, মেঘগর্জ্জনও ক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার রহিল।

গোকুলজী কহিল, আর আমরা থাকিতে পারি না। এখন আর কোন ভয় নাই। আমরা চলিলাম।

গৌরী গোকুলজীকে সম্বোধন করিয়া মধুরকণ্ঠে কহিল, তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? ইনি আমাকে এমন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ইঁহারও ত একটা কথা রাখা উচিত। আকাশ এখনও অন্ধকার হইয়া আছে, আজ রাত্রি এখানে থাকিলে দোষ কি? তুমি কিছু খাও দাও। ঘোড়াটাকে কিছু খাইতে দাও, তার পর কাল সকাল যাইব।

গোকুলজী কঠোরস্বরে কহিল, এখনি যাইতে হইবে। তুমি আর বিলম্ব করিও না, উঠিয়া আইস।

গোকুলজীর অন্ধকার মুখ দেখিয়া গৌরী আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। তারার নিকটে বিদায় লইবার মানসে তাহার চরণস্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। তারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিল। গোকুলজী আসিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, অনর্থক আর বিলম্ব করিও না! আমার সঙ্গে আইস।

গৌরী অতিমাত্র বিস্মিতা, অজানিত ভয়ে ভীতা হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় গোকুলজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাহিরে আনিয়া গোকুলজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া শীঘ্রগমনে চলিয়া গেল। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

পর্ব্বতের পথ অত্যন্ত উচ্চনীচ, গোকুলজী শীঘ্রই পথ চিনিয়া লইয়া তারার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

তখন, কুটীরমধ্যে প্রস্তরাসনে বসিয়া অভাগী তারা রোদন করিতে লাগিল। দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া সেই প্রাণীশূন্য ভয়ঙ্কর স্থানে আপনার অদৃষ্ট ভাবিতে লাগিল। অঙ্গুলির মধ্য দিয়া আগে বড় বড় দু ফোঁটা অশ্রুজল, দুইটা মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িল। তার পর আরও দু ফোঁটা,

তার পর অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ভাবিল, কি ... সংসারে আসিয়াছিলাম! পূর্ব্বজন্মকৃত কত পাপের ফল ভোগ করিতেছি। গোকুলজী, কুক্ষণে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেন গৃহবহিষ্কৃত হইয়াছিলাম, তা কি তুমি জান না? সে কথা যে বলিবার নয়, গোকুলজী, তা নহিলে আজ আমি তোমায় সব কথা খুলিয়া বলিতাম। বুকে যে পাথর বাঁধিয়াছি, আজ সে পাথর তোমার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। লোকে বলিবে তারা মহাপাপিষ্ঠা। তারা কেন যে পাপিষ্ঠা হইল, তাহা ত কেহ জানিবে না। গোকুলজী, গৃহত্যাগ করিয়া এই পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, কার আশায় তা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? হায়, হায় স্বপ্নের কথা কেন ভুলিলাম? কেন আবার লোকালয়ে ফিরিলাম? যে সুখ অদৃষ্টে নাই কেন সে সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম? পর্ব্বতশিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম না কেন? গোকুলজী ত আমার মনের কথা কিছুই জানিবে না। সে ত আমাকে চিরকাল ঘোর পাপিষ্ঠা মনে করিবে। তাহাকে সব কথা না বলিয়া কেমন করিয়া মরিব? সে যদি নিরপরাধে আমাকে গুরুতর অপরাধিনী মনে করে, তাহা হইলে আমি মরণেও শান্তি পাইব না। কেন গোকুলজীর সহিত বিবাদ করিলাম, কেন তাহাকে কুকথা বলিলাম? কেন তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলাম না, কেন তাহার নিকটে সব কথা বলিলাম না? তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয়ে দয়া হইত, তাহা হইলে সে আমায় তৃণবৎ পায়ে ঠেলিয়া যাইত না। তাহাকে বলিয়াই বা কি ফল! গোকুলজী আমাকে মন্দ মনে করিল, তাহাতেই বা আমার কি? আমি ত আর তাহাকে পাইবার আশা রাখি না। এই যে ননীর পুতুলের মত সুন্দরী দেখিলাম, ওই কি গোকুলের স্ত্রী নয়? স্ত্রী নয় ত কি? বিবাহ না করিয়া থাকে, বিবাহ করিবে। গোকুলজীর ত কখন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার নয়। মাগীকে যত জিজ্ঞাসা করি তত হাসে আর কেবল বলে "না।" ইচ্ছা হইল ছুঁড়ীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিই। তারি বা অপরাধ কি? কাকেই বা দোষ দিই? দোষ ত আমার অদৃষ্টের। কপালে কোন সুখই লেখে নাই। আমার মত পোড়াকপালীর মরণ হওয়াই ভাল।

বিষাদ, বিদ্বেষ, ক্ষীণ আশা, প্রবল নিরাশা, এইরূপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী

আরও কত ভাব তুমুল বেগে তারার হৃদয়ের মধ্যে আন্দোলিত, আলোড়িত, পরস্পর প্রতিহত হইতে লাগিল। সে একাসনে নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া অনবরত নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। রোদন আর চিন্তা। দুই নয়ন দিয়া অশ্রুধারা অবিরত একভাবে প্রবাহিত হইতেছে। চিন্তার ধারা সহস্রমুখে ছুটিতেছে। অশ্রুধারা একমুখী, চিন্তা সহস্রমুখী। রমণীর অতল হৃদয়ে অগণিত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

অন্ধকার মেঘের অন্তরালে সূর্য্য অলক্ষিতে অস্তমিত হইল। মেঘ দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্ধকার করিয়া রহিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারকে ভয় দেখাইয়া বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। আকাশে একটীও তারা উঠিল না। আকাশ, পর্ব্বত, সমভূমি সব এক হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একটী পাখী ডাকিল না। সমীরণ একএকবার সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া আসে, আবার ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করে। হরিণী বৃক্ষমূলে অঙ্গ রক্ষা করিয়া নিদ্রার জন্য আসিল না। অন্ধকার গাঢ়, গাঢ়তর হইয়া আসিল। বৃক্ষপত্র বহিয়া প্রস্তরের উপর টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। শৃগাল ভয়ে প্রহর ডাকিল না। গুটিকতক খদ্যোতিকা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধকারের গর্ভে ডুবিয়া গেল। ক্রমে বিদ্যুৎ বিরল হইল। বায়ু সঞ্চরণ ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া একেবারে রহিত হইল। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। অন্তঃশূন্য, দিগ্বিদিক্‌শূন্য, জনপ্রাণীশূন্য, ভয়ময় অন্ধকার ভূমণ্ডল অধিকার করিল। পর্ব্বত ঝরণার পতনশব্দ নিস্তব্ধের মধ্যে অতি ভীষণ শ্রুত হইতেছে। জীবনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না, সৃষ্টি যেন অন্ধকারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। কেবল অন্ধকারের অদৃশ্য, ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-ভঙ্গ নিঃশব্দে কোলাহল করিতে লাগিল।

সে সময় সেই পর্ব্বতের উপরে মনুষ্যের অবস্থান কদাচিৎ সম্ভাবিত নহে। পর্ব্বতবাসী পশুকুল পর্য্যন্ত ত্রাসে পলায়ন করিয়াছিল, মনুষ্য কোন সাহসে সেখানে বাস করিবে? সে স্থান দেখিলে কে বলিত যে সেখানে জীবিত প্রাণী বাস করে? কে বলিত যে সেই সময় দগ্ধচিত্ত রমণী একাকিনী সেই পর্ব্বতপ্রদেশে বসিয়া আপনার ভাবনায় মগ্ন ছিল? ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া অজস্র রোদন করিতেছিল? বাহিরের বিভীষিকাময়ী রজনী

দেখিয়া সে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই? সে দিকে তাহার মনই ছিল না! আপনার হৃদয়সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে আকুল, আর কোন দিকে চাহিবার তাহার অবসর ছিল না। মথ্যমান জলধির ঘোর গর্জ্জনে বধির যে, তাহার অন্যদিকে কর্ণপাত করিবার সাধ্য কি? মানুষের মন অগাধ, অপার, অনন্ত,—অসীম সমুদ্র ত তাহার ক্ষুদ্র উপমাস্থল মাত্র। সে সমুদ্র কেহ দেখিতে পায় না, এ জন্য সে সমুদ্র অপ্রমেয়। সে সমুদ্রকল্লোল কেহ শুনিতে পায় না, এ জন্য সে সমুদ্র ভয়ঙ্কর। সে সমুদ্র মানুষে কল্পনা করিতে পারে, এই জন্য সে সমুদ্র অতি বিশাল।

সেই সমুদ্রে তুফান উঠিয়াছে!

কুটীরের বাহিরে যে রজনী বড় ভয়ঙ্করী, তারা সে কথা একবার মনে করিল না। কিছু আহার কবিল না। একবার উঠিল না। এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রা তাহার চক্ষে আসিল না। চতুষ্পার্শে অত্যন্ত অন্ধকার এবং ভয়ানক নিস্তব্ধ। সে স্থলে মনুষ্য ভয়বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হয়। চতুষ্পার্শে সেই অন্ধকার, মধ্যস্থলে রুক্ষ জটাধারিণী রমণী। বাহিরে দৃষ্টি নাই, বাহিরে দৃষ্টি করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। নিমুদিত নয়নে হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। মুদ্রিত নয়নে দর দর ধারা। নয়নজলে হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাণ করিবার প্রযত্ন করিতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

খড় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল দেখিয়া সকলে আগুন নিভাইতে ছুটিল। আগুন লাগিলে যত লোকে চীৎকার করে, তত লোকে কখনই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার যত্ন করে না। কথায় বলে, 'কারও সর্ব্বনাশ, কারও পোষ মাস।' জল আনিতে আগুন নিভাইতে মরাইয়ের ধান ভস্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু অগ্নি আর বিস্তৃত হইল না। রঘুজীর গৃহ রক্ষা পাইল।

গ্রামের লোকে পূর্ব্বেই তারাকে বড় দুরন্ত মনে করিত। এখন লোকে তাহাকে রাক্ষসী স্থির করিল। জননীরা শিশুদিগকে তাহার নাম করিয়া ভয় দেখাইত, যুবতীরা ভয়ে তাহার নাম পর্য্যন্ত করিত না।

রঘুজীর পীড়া সেই রাত্রে বৃদ্ধি হইল। সে আর তারার নাম করিত না। তারাকে অন্বেষণ করিয়া ধৃত করিবার জন্য দুইজন লোক সম্মত হওয়াতে রঘুজী তাহাদিগকে গালি দিল। বলিল, আমার কন্যা মরিয়াছে। তাহাকে খুঁজিবার আবশ্যক নাই।

পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। গ্রামের চিকিৎসক যথাসাধ্য প্রলেপ ও অন্যান্য ঔষধি প্রয়োগ করিলেন; কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। পীড়ার সময়ে শম্ভুজী দিবানিশি রঘুজীর নিকটে থাকিত। সকলেই বুঝিল এবার রঘুজী রক্ষা পাইবে না। কেবল রঘুজী এ কথা বিশ্বাস করিত না। একদিন চিকিৎসক বলিলেন, রঘুজী, তুমি আপনার বিষয় আশয়ের একটা বন্দোবস্ত কর, মানুষের কবে দিন আসে বলা ত যায় না।

রঘুজী অত্যন্ত বিস্মিত ও কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি মরিব না কি?

চিকিৎসক। না, তা নয়। তবু ত কিছু বলা যায় না। ব্যারাম দিন দিন বাড়িতেছে, তোমার আর উত্থানশক্তি নাই। মানুষ কখন আছে কখন নাই, তা ত কেহ বলিতে পারে না।

রঘুজী রাগিয়া কহিল, তুমি দূর হও। তুমি আমায় আরোগ্য না করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছ।

চিকিৎসক, রোগী হাতছাড়া হয় দেখিয়া, তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। অর্থের প্রত্যাশা মানুষে, বিশেষ চিকিৎসকে সহজে ছাড়িতে পারে না। রঘুজীর খাটের পাশে তাহার লাঠি থাকিত, সেই লাঠি ধরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিল। কবিরাজের মাথা কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। তিনি দুই হাতে মাথা ধরিয়া কাতরোক্তি করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছিল। রঘুজী ভীত হইয়া শম্ভুজীকে ডাকাইয়া আপন সম্পত্তি তাহাকে দান করিতে চাহিল। শম্ভুজী তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অতঃপর তাহার পরামর্শে রঘুজী দুই জন সাক্ষীর সমক্ষে আর এক দানপত্র লিখাইল, তাহার মর্ম্ম কেহ জানিল না।

মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে রঘুজীর বিকার হইল। বিকারাবস্থায় অনর্গল প্রলাপ উচ্চারণ করিত। সে সকল কথা কেবল শম্ভুজী আর সেই দাসী শুনিত। প্রলাপকালীন অনেক কথা তাহারা বুঝিতে পারিত না, অনেক কথা শুনিয়া তাহাদের লোমহর্ষণ হইত। রঘুজী কখন কখন তারার নাম করিত। কখন কখন অন্যমনে আর কাহার নাম করিয়া স্নেহের দু একটী কথা বলিত। তাহাতে পাতকের পাপ কথা আরও ভয়ঙ্কর শুনাইত।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস রঘুজী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। নিকটে শম্ভুজীকে না দেখিতে পাইয়া, তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। শম্ভুজী আসিল না। রঘুজী তখন তাহাকে অশ্রাব্য গালি পাড়িতে লাগিল। তাহাতে সে আবার বিকারগ্রস্ত হইল। পর দিবস তাহার মৃত্যু হইল।

তারা শম্ভুজীকে আঘাত করিল দেখিয়া মহাদেব পলায়ন করিয়াছিল। এতদিন যে সে শম্ভুজীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিয়াছিল, তাহার একটী কারণ ছিল। মহাদেব মনে করিত তারা ফিরিয়া আসিলে শম্ভুজী ঈদৃশ কঠোর আচরণ পরিত্যাগ করিবে। বৃদ্ধবয়সে যায়ই বা কোথা? কেহ ত তাহাকে বিনা পরিশ্রমে আহার যোগাইবে না। এইরূপ সাত পাঁচ

ভাবিয়া সে কোথাও যায় নাই। তারার নির্ব্বাসনের পর নিজের কষ্টের দিকে তাহাব আর বড় দৃষ্টি ছিল না। মায়ির মৃত্যুর পর তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জীবনে অনাস্থা এবং মরণ তাহার একমাত্র কামনা হইয়া উঠিল। চিত্ত অবশ, শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল। শম্ভূজীর উৎপীড়নে শরীরও ভগ্ন হইয়া পড়িল। নানা কারণে মহাদেব এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও পলায়নে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে সময় দেখিল শম্ভূজী দারুণ আঘাতে ধরাশায়ী হইল, তখন নানাবিধ নূতন আশঙ্কায় তাহার চিত্ত অধিকৃত হইল। মনে করিল শম্ভূজী আরোগ্য লাভ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। এইরূপ নানাবিধ আশঙ্কায় বিকৃতচিত্ত হইয়া পলায়ন কবিল।

গ্রামের অনেকে সময়ে অসময়ে মহাদেবেব নিকট উপকৃত, শম্ভূজীব হস্তে তাহাব নির্যাতনের সংবাদ পাইয়া অনেকের দয়াব উদ্রেক হইয়াছিল, এজন্য মহাদেবকে অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইল না। তাহাকে প্রতিদিন খাইতে দেয়, গ্রামে এমন কাহারও সঙ্গতি ছিল না, পর্য্যায়ক্রমে দুই এক বেলা করিয়া সকলে আহার করাইত। রাত্রিকালে মহাদেব একজনেব বাড়ীতে শয়ন করিত। গ্রামে অনেকেই রঘুজীর টাকা ধারে, সে ইচ্ছা করিলে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া মহাদেবকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিত। এখন রঘুজী পীড়িত, মৃত্যুশয্যায় শয়িত, সুতরাং সে কিছু করিতে পারিল না। মহাদেবের অন্নকষ্ট রক্ষা হইল।

রঘুজীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মহাদেব মনে করিল, তারাকে ডাকিয়া আনিব। এখন ত তাহারি বাড়ী, তাহারি ঘব, সে কেন পাহাড়ে বনের পশুর মত থাকে? তারাকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া লইব। এই সঙ্কল্প করিয়া পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা কবিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতের প্রস্থদেশে চঞ্চললোচনা বিকলাঙ্গী তারা উন্মাদিনীর মত বিচরণ করিতেছে। কোন দিন আহার নাই, কোন রাত্রে নিদ্রা নাই, অসীম আকাশে কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় অসংযত উদ্ভ্রান্ত গতিতে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। হৃদয় মধ্যে কখন নরকের জ্বালা, কখন শূন্যময় নিরাশা। ঝঞ্ঝাতাড়িত, আবর্ত্তসঙ্কুল, ভীমনাদে কল্লোলিত হৃদয় সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে ব্যাকুলিত হইয়া বিবেকশূন্য হইয়া তারার চিত্তের বিকৃতি জন্মিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র আলোক দেখিতে পাইল,—মরণ! কিন্তু আত্মঘাতিনী হইতে তারার প্রবৃত্তি হইল না, সাহস হইল না। ভাবিল, কেন মরিব? কাহার তরে মরিব? আত্মহত্যা করিয়া কেন অনন্ত নরক ভোগ করিব? গোকুলজীকে পাইলাম না বলিয়া মরিব? গোকুলজী আমার কে? আমার শরীরে রমণীর ধর্ম্ম কিছুই নাই তবু আমি পতঙ্গের মত কেন প্রণয়ানলে ঝাঁপ দিই? মরিলেই বা আমার কি সুখ? লোকে না জানুক, আমি ত জানিব যে গোকুলজীর জন্য প্রাণত্যাগ করিলাম। ছি! ছি! সহস্র নরক যন্ত্রণা এ চিন্তার তুল্য নয়। আমি মরিব না।

তারা মরিল না। কিন্তু বাঁচিয়াও কোন সুখ দেখিতে পাইল না। চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ সর্ব্বদা ভ্রমণ করিত। কুটীরের আশ্রয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল।

এই অবস্থায় একদিন মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া মহাদেব ভীত হইল। মনে করিল, পাগল হইয়া গিয়াছে। মহাদেবকে দেখিয়া তারা চক্ষু স্থির করিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, শম্ভুজী তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছে?

মহাদেব মাথা নাড়িল। ধীরে ধীরে সমস্ত কথা তারাকে অবগত করাইল। রঘুজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া, জানুদ্বয়

মধ্যে মস্তক রাখিয়া তারা চিন্তা করিতে লাগিল। পিতৃবিয়োগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল, বলিলে, মিথ্যা বলা হয়। বুঝি সে হৃদয় বড় কঠিন, বুঝি সে চক্ষের জল ফুরাইয়াছিল, তাই সে কাঁদিল না। কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, মাথা তুলিয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন ত শম্ভুজীই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী?

মহাদেব বলিল, না, সে কেন বিষয় পাইবে? মরণের সময় বোধ হয় তোর বাপের বুদ্ধি ফিরিয়া থাকিবে। শম্ভুজী বলিতেছে, তারার বাড়ী, তারার বিষয়, সে আসিলেই, তাহার হাতে সব বুঝাইয়া দিব। আমি তোকে ডাকিতে আসিয়াছি। তোর বাড়ীতে এখন তুই না থাকিবি ত কে থাকিবে? তুই না ফিরিলে আমি বা কোথায় আশ্রয় পাইব?

তখন তারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের হাত ধরিল, কহিল, তবে চল, বাড়ী যাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তারা ফিরিয়া আসিল। এবার আর গোগৃহে যাইবার আদেশ শুনিতে হইল না, এখন তারাই গৃহকর্ত্রী। রঘুজীর যাহা টাকা ছিল, তাহা শম্ভুজীর হাতে। তারা আসিবামাত্র শম্ভুজী তাহার হাতে চাবি দিয়া টাকা বুঝাইতে আরম্ভ করিল। তারা বড় লজ্জিত হইল। শম্ভুজী তারার নিকট অপমানিত হইয়া, প্রহার সহ্য করিয়াও প্রতিশোধ লইবার কোন চেষ্টা করিল না। রঘুজীর অর্থে হস্তক্ষেপ করে নাই, এখন আবার তারাকে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতেছে। তারা হিসাব পত্র কিছু না শুনিয়া, কিছু লজ্জার সহিত,

কিছু বিষণ্ণভাবে কহিল, শম্ভুজী, আমাকে হিসাব বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তুমি আমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি এই অর্থের অর্দ্ধাংশ লইয়া যাও।

শম্ভুজী বলিল, আমি এক পয়সাও লইব না। তোমার সম্পত্তি তুমি সুখে ভোগ কর।

তারা কহিল, না লও, আমি তোমায় পীড়াপীড়ি করিব না। কিন্তু এ বাড়ীর সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। যাহারা এ বাড়ীর বেতনভোগী তাহারা পূর্ব্বের মত নিযুক্ত থাকিবে।

শম্ভুজী কোন উত্তর কবিল না, একবার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিল। তারা দেখিল তাহার মস্তকে বৃহৎ ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। বুঝিল, শম্ভুজী কিছু বিস্মৃত হয় নাই।

শম্ভুজী কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রঘুজীর কন্যা ফিরিয়া আসিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছে শুনিয়া গ্রামের লোকে বড় ভয় পাইল। যে দাসী তারাকে অপমানিত করিয়াছিল, সে রঘুজীর মৃত্যুর পরেই অন্যত্র চলিয়া গেল। যাহারা রঘুজীর অন্নে প্রতিপালিত তাহাবা মনে করিল, এইবার আমাদের অন্ন মারা যাইবে। লোকে মনে করিল তারা বাই না জানি কতই অত্যাচার করিবে।

তারা বাই সে সব কিছুই করিল না। যে দিন গৃহে ফিরিল, তাহার পর দিবস ভৃত্য, ক্ষেত্রের কৃষাণ, রাখাল, সকলকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা যেমন পূর্ব্বে কাজ করিতে তেমনি করিবে। কাহারও চাকরি যাইবে না।

এই কথা শুনিয়া তাহারা বড় বিস্মিত, আহ্লাদিত হইয়া আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আনন্দ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রঘুজীর লাঠির চিহ্ন তাহাদের অনেকেরই পিঠে ছিল, সে দাগ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এখন আর কেহ তাহাদিগকে মারে না। পূর্ব্বে কর্ম্মে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে, রঘুজী মাহিয়ানা কাটিত, এখন আর সে সব নাই। কোন ঝঞ্ঝাটই নাই। পরিজনবর্গের মধ্যে তারার বড় প্রশংসা উঠিল।

মহাদেবের দিন ফিরিল। সে এখন পায়ের উপর পা দিয়া রাজার হালে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তারা তাহাকে কোন কর্ম্ম করিতে দেয় না, নিকটে বসিয়া আহার করায় আরও সহস্র যত্ন করে। সময়ে সময়ে মহাদেবের নিকট মায়ির জন্য কাঁদিত। মহাদেব অল্প কালের মধ্যেই আবার সুস্থকায় ও সবল হইয়া উঠিল। তখন সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে অসম্মত। তারাকে কহিল, "চাকর বাকর গুলা সব ফাঁকি দেয়, তুই ত তাহাদের দেখিবি না। আমি তাহাদের কাজ কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিব।" তারা মহাদেবের আগ্রহ দেখিয়া সম্মত হইল। মহাদেব সেই অবধি একরূপ ঘরের কর্ত্তা হইয়া উঠিল।

গ্রামের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দীন, দুঃখী, তারার অনুরোধ মতে মহাদেব তাহাদের সন্ধান লইত। তারা মলিন বেশে স্বয়ং তাহাদের সাহায্য করিতে যাইত। ইহাতে লোকে আরও আশ্চর্য্য হইল।

সুদে কর্জ্জ দেওয়া তারা আসিয়া বন্ধ করিল। গ্রামের লোকেরা বড় গরিব, অনেক সময় তাহাদের ধার করিতে হয়। রঘুজী সুদে সুদে তাহাদের রক্ত শোষণ করিতেছিল, এখন তাহারা বিনাসুদে ঋণ পাইয়া দুই হাত তুলিয়া তারাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

বেশভূষায় তারার কখন তেমন অভিরুচি ছিল না। এখন সে ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল গহনা পরিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া গ্রামের যুবতীদিগের বড় হিংসা হইত। বুড় বুড়ীরা বলিত, আহা, পরুক্, পরুক্, বাপ থাক্‌তে ত কোন সাধ মেটাতে পারে নাই। এখন একটী বর মিলিলেই হয়, তা হলে সব সুখই হয়। এত গুণের মেয়ে কখনো হয় না।

বর ত মিলিবার ভাবনা ছিল না, কিন্তু কন্যার মনের মতন বর এখন কোথায় পাওয়া যায়? রঘুজী ত আর নাই, যে জোর করিয়া তারার বিবাহ দিবে। তারার আর কোনও অভিভাবক নাই, সে ইচ্ছা করিলেই নিজে বিবাহ করিতে পারে। মহাদেব বারকতক বিবাহের জন্য খোঁচাখুঁচি করাতে তারা কিছু বিরক্ত হইল, বলিল, আমি বিবাহ করিব না। মহাদেব মুখে আর কিছু বলিল না, কিন্তু মনে করিল, যদি বিবাহই না করিবে, ত এত সাজগোজ কিসের জন্য? আগে ত এসব কিছু ছিল না।

গ্রামের জন কতক যুবকের আশা ছিল, তাহারা তারার প্রণয় চক্ষে পড়িবে। এই আশায় তাহারা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। মহাদেব তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। যুবকদিগের আশা ছিল ক্রমশঃ তারার সহিত কথোপকথন চলিবে। তারা, তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। তাঁহারা অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভূজী কোন কথা ভুলিবার লোক নয়। মনের কোন সঙ্কল্পও সহজে ছাড়িতে জানে না। মস্তকের কুঠার চিহ্ন সে একদিনের, একদণ্ডের তরেও ভুলিয়া যায় নাই, তথাপি সে তারার কোন অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল না। মৃত্যুকালে রঘুজী আপনার সঞ্চিত অর্থ সমুদয় তাহাকে দিতে চাহিয়াছিল, তাহা সে লইল না। তারা তাহাকে আপনার গৃহে আসিতে নিষেধ করিল, তাহাতেও সে ভাল মন্দ কিছুই বলিল না। কেন? শম্ভূজী ত কোন সদ্‌গুণে ভূষিত নহে। এরূপ আচরণের নিশ্চিত কোন গূঢ় কারণ থাকিবে।

মস্তকে আহত হইয়া শম্ভূজীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রথমে বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিল মস্তকের ক্ষতচিহ্নের শোধ তুলিবে। এই সময় শম্ভূজী নিজের মন বুঝিতে পারিল না। তাহার মস্তকে ক্ষতস্থান চিহ্নিত হইবার পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ের মধ্যে আর এক মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সে মূর্ত্তি তারার। শম্ভূজী যত তারাকে পরম শত্রু বিবেচনা করিবার চেষ্টা করে,

প্রণয়ের অপূর্ব্ব বন্ধন আরও হৃদয়ের মধ্যে জড়িত হইয়া যায়। অপমানের শোধ দিব মনে করিলেই তারাকে বিবাহ করিবার আশা উদিত হয়। দ্বেষ, ক্রোধ, অপমানজ্ঞান কিছুই রহিল না। প্রণয়ের বহ্নিতে আর সব আগুন মিশিয়া গেল। নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাব সমূহ মিশ্রিত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইল। অগ্নি সর্ব্বভুক, আগুন লাগিলে সব জ্বলে। শম্ভুজীর মস্তকের কেশাগ্র হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত কেবল জ্বলিতে লাগিল,—প্রণয়। বুদ্ধি, চৈতন্য, হিতাহিতজ্ঞান সব লুপ্ত হইল। জীবন তারাময় হইয়া উঠিল। কেবল ভাবিত কিসে তারা আমার হইবে। এ অগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিতে হৃদয় প্রায় দগ্ধ হইয়া গেল। তারা! তারা! তারা! তারার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিল। সে নাম তাহার একমাত্র মোহমন্ত্র হইয়া উঠিল। তারা তাহাকে হতশ্রদ্ধা করে, বিদ্রূপ করে, একবার প্রায় হত্যা করিয়াছিল, এখন সে তাহার সহিত চাক্ষুষ দেখা হইলে বিরক্ত হয়, এ সকল কথা কি শম্ভুজী জানিত না? সব জানিত। তারা যে আর একজনকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে, তাহাও সে জানিত। কেমন করিয়া জানিল, তাহা কিছুই জানি না। লোকে বলে প্রেম অন্ধ, আবার প্রেম যেমন দেখিতে পায়, যেমন শুনিতে পায়, এমন আর কেহ পারে না। তবে মিছামিছি হৃদয়কে ভস্ম করিয়া কি হইবে? তারাকে ত পাইবার কিছুমাত্র আশা নাই, তবু শম্ভুজী দিনরাত্রি সেই চিন্তা করে কেন? যাহাকে পাইবার নয়, তাহাকেই চায় কেন?

ঐ ত গোল। যাহা পাই না তাহাই চাই। জননীর কোলে বালক, আর কিছু চায় না, চায় আকাশের চাঁদ। এত জিনিস আছে, কোটি চন্দ্রের অপেক্ষা সুন্দর এমন মায়ের মুখ রহিয়াছে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শিশু,—তাহার কিছুতেই মন ওঠে না। আকাশে ওই যে চাঁদ আছে সেইটী চাই। অপ্রাপ্য সামগ্রী পাইবার জন্য মানুষ চিরকাল বালকের মত লালায়িত হয়।

শম্ভুজী হৃদয়কে বুঝাইতে পারিল না। তারাকে পাইবার আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে জীবন ধারণ অসম্ভব। শম্ভুজী সে আশা ত্যাগ করিল না। প্রাণপণে তাহা পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হৃদয়ের এই অবস্থা, এই প্রেমাত্মক ভাব তাহাকে গোপন করিতে

হইবে, নহিলে আশা সফল হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিবে না। শম্ভুজী তাহাই করিল। তাহার চিত্তের প্রকৃত অবস্থা কেহ জানিল না।

তারা ফুলগাছ বড় ভাল বাসে। উদ্যানে পুনরায় পুষ্পবৃক্ষ রোপন করাইয়া প্রতিদিবস সায়ংকালে সেই স্থলে পাদচারণ করিত। একদিন অকস্মাৎ সেই স্থানে শম্ভুজী আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া তারা বড় অপ্রসন্ন হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আবার যে এখানে আসিয়াছ? আমি ত তোমাকে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি।

শম্ভুজী কহিল, আমি ত পূর্ব্বেকার কোন কথা বলিতেছি না। যদি তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তবু যদি তুমি আমাকে আসিতে বারণ কর, তাহা হইলে না হয় আর আসিব না। যদি আমাকে আসিতে দাও, তাহা হইলে দু একটা খবর সময়ে সময়ে শুনিতে পাও।

তারা উত্তর করিল, আমার কোন খবরে কাজ নাই। যাহা দরকার তাহা মহাদেবের কাছে শুনিতে পাই।

শম্ভুজী। গোকুলজীর বিবাহ হইবার কত কথা হইতেছে, শুনিয়াছ কি?

তারা বলিল, গোকুলজীর বিবাহ হইলে আমার কি? আমায় এ সংবাদ দেওয়ার আবশ্যক?

তারার স্বরের কিছু বিকৃতি হইল না, কিন্তু মুখ বড় মলিন হইয়া গেল।

শম্ভুজী যেন ভিতরের কিছুই জানে না, অম্লানমুখে বলিল, তোমার পিতার সহিত গোকুলজীর একদিন বিবাদ হইয়াছিল, তুমি তাহা দেখিয়াছিলে। আমি ভাবিয়াছিলাম গোকুলজীকে তোমার মনে থাকিতে পারে। না থাকে ত আর সে কথায় কাজ নাই:

এই বলিয়া শম্ভুজী প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইল।

এখন, তারার হৃদয়কন্দরনিহিত অনলে আহুতি পড়িয়াছিল। কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া মাত্র শম্ভুজী ফিরিয়া যায়। তারা টোপ গিলিল দেখিয়া শম্ভুজী দড়ী হাতে ফিরিল। এদিকে দড়ীতে টান পড়িল। তারা অন্তরের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গোকুলজীর কোথায় বিবাহ হইল?

শম্ভুজী যেন দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক, ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, সে সব অনেক কথা। লোকে যে কত রকম বলে কিছু বলা যায় না। কিন্তু বিবাহ স্থির।

তারা অধীর হইয়া শম্ভূজীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে, ঠিক ঠিক বল, আমার কাছে কোন কথা লুকাইও না।

হাসি চাপিয়া শম্ভূজী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—এত ধীরে যে তারাব অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, অথচ সে বিরক্তি মুখেও প্রকাশ করা যায় না,—গোকুলজীর বিবাহ গ্রামেই হইবে, অন্য গ্রামে নয়। কিন্তু এমন নূতনতর বিবাহ কেহ কখন দেখে নাই। কন্যাটীব নাম গৌরী, তাহাকে গোকুলজী মাস দুই হইল কোথা হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। কোথায় নিবাস, কি জাতি, কাহার কন্যা কেহ কিছু জানে না। যদি একেবারে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিত, তাহা হইলে কোন কথাই থাকিত না। সেই জন্য কত লোকে কত মন্দ বলে। তাহারা একত্রে থাকে না। গোকুলজী কন্যাটীকে এক বুড়ীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে, নিজেও অনেক সময় সেই খানেই থাকে। এখন তখন করিয়া আজ পর্য্যন্ত বিবাহ হইল না। গোকুলজী কাহাকেও কিছু বলে না, গৌরীও কিছু বলে না। কাজেই লোকে কত কি মনে করে।

এই সকল কথা শুনিয়া তারা সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একটী গাছের পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ভাবিতে লাগিল। শম্ভুজী ততক্ষণ ক্ষুধিত লোচনে তারাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। অবশেষে তারা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সেইদিন হইতে শম্ভুজী সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তারাও আর কিছু বলিত না। শম্ভুজী আত্ম সম্বন্ধে কোন কথাই বলিত না, অনবরত গোকুলজী ও গৌরীর বিষয়ে নানা কথা বলিত। তাহার মধ্যে কিছু সত্য, অধিকাংশ শম্ভুজীর স্বকপোলকল্পিত। তারাও আর কিছু সন্দেহ না করিয়া, বিমনা হইয়া তাহার কথা শুনিত। তারা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। গোকুলজীর আশা অল্পে অল্পে হৃদয় হইতে অন্তরিত হইতে লাগিল। শম্ভুজী কতক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া বসিয়া গল্প করিত। কতক্ষণ প্রেমপূর্ণ কাতরনয়নে কখনও পাপের অনলচক্ষে চাহিয়া থাকিত। তারা কিছুই লক্ষ্য করিত না। লোকে

কত কথা রটাইতে পারে, তাহা একবারও মনে করিত না। কেবলই ভাবিত। দুঃখের অন্ধকার ছায়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

শম্ভুজী অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। তাহার শরীরে সর্ব্বক্ষণ অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

এইরূপে মাস কয়েক গেল। ভাবনায় ভাবনায় তারার শরীর অবসন্ন হইল। চক্ষের কোলে কালি পড়িল। সে অস্থির বিদ্যুতের মত দৃষ্টি আর নাই। দুপভাঙ্গা, নিরাশ মূর্ত্তি। চক্ষের দৃষ্টি যেন অভাবময়, যেন শূন্যময়। যেন সে চক্ষে কি ছিল, আর যেন নাই। মুখের উপর কেমন একটী জ্যোতির্ম্ময় ভাব ছিল, সেটী যেন কে অপহরণ করিয়াছে। প্রদীপশিখার কিরণ একটী একটী করিয়া আবৃত করিলে যেমন সে আলোক হীনপ্রভ হয়, তেমনি সে মুখ মলিন হইয়া গেল।

তাহা দেখিয়াও শম্ভুজীর দয়া হইল না। সে ত ইহাই চায়। গোকুলজীর মূর্ত্তি তারার হৃদয় হইতে অপনীত হইলে, সে হৃদয়ে স্থান পাওয়া সহজ হইবে, এই আশায় সে প্রতিদিন গোকুলজীব বিরুদ্ধে নানা কথা বলিত। তারা সব কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিত।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, শম্ভুজীর ধৈর্য্য চ্যুত হইল। আর তারাকে দেখিয়াই তৃপ্তি হয় না। একদিন সন্ধ্যার সময় তারা অধোবদনে গৃহদ্বারে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন্ সময় শম্ভুজী আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। তারা সেইরূপ নিম্নমুখে স্থির ভাবে বসিয়াই রহিল।

শম্ভুজী কহিল, তারা, তোমার এত ভাবনা কিসের? গোকুলজীর বিবাহ হইলে তোমার কি ক্ষতি?

তারা মুখ না তুলিয়া বলিল, আমার ক্ষতি কি?

শ। তুমি মনে কর আমি তোমার মন বুঝি না। গোকুলজী যখন তোমার ভাবনা ভাবেনা, তখন তুমি কেন অনর্থক তার জন্য কষ্ট পাও? ছি! তাহাকে মনে স্থান দিলে তোমার পাপ হইবে।

তারা মস্তক উত্তোলন না করিয়াই কহিল, মরার উপর খাঁড়া মারিলে কি লাভ, শম্ভুজী? আমি মনে মনে আপনাকে যত ধিক্কার দিয়াছি, তত আর কেহ দিতে পারিবে না। পাপ চিন্তাকে আর মনে স্থান দিব না।

শম্ভুজী তখন মনোভাব গোপন না করিয়া বলিয়া উঠিল, তারা, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ দেখি। যে দিন অবধি তোমাকে দেখিয়াছি, সে দিন হইতে আমার আর দ্বিতীয় চিন্তা নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, আমার দিকে ফিরিয়াও চাও নাই, আমাকে অপমানিত করিয়াছ, আমার প্রাণসংহারে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছিলে। তুমি আমার কি লাঞ্ছনা না করিয়াছ? আর আমি? তোমার জন্য তোমার পিতার নিকট কতবার তিরস্কৃত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তোমার পিতা আমাকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিতে চাহিলেন। আমি লইলাম না। কাহার জন্য? আমি কি টাকার কাঙ্গাল? আমি কি এমনি নীচাশয় যে তোমাকে গৃহশূন্য, সংস্থানশূন্য করিয়া তোমার পিতার ত্যক্তসম্পত্তি ভোগ করিব? আমি তোমাকে কতবার ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কখনও এক নিমেষের জন্য ভুলিতে পারি নাই। কি দোষে আমি তোমার চক্ষের শূল হইলাম? গোকুলজী কোথাকার কে, যে তুমি তাহার জন্য পাগল হইয়াছ? কয়বারই বা তাহাকে দেখিয়াছ? আমাকে বিবাহ করিলে কি তুমি পতিত হইবে?

শম্ভুজীর কথা সমাপ্ত হইলে, তারা মাথা তুলিয়া, সজলনয়নে, করুণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, শম্ভুজী, আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ কর। আমি পাপীয়সী, মনে মনে পরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমাকে কেন বিবাহ করিতে চাহিতেছ? আমাকে বিবাহ করিয়া ত সুখী হইবে না। আমার অপেক্ষা তোমার কত সুন্দরী স্ত্রী মিলিবে। ছি! ছি! আমি কি তোমার উপযুক্ত?

শম্ভুজী সেই কাতরকটাক্ষে উন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিল, তুমি আমার উপযুক্ত নও, না আমি তোমার স্বামী হইবার অনুপযুক্ত? তুমি সহস্র পাপ করিলেও আমার চক্ষে পরম পুণ্যবতী। আমায় রাখ, আমায় বিবাহ কর। তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না।

তারা কহিল, ছি! ওকথা আর বলিও না।

শম্ভুজী ক্ষিপ্তের মত তারাকে বাহুদ্বারা বেষ্টিত করিয়া কহিল, তুমি আমার, আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।

বালকের ভুজবন্ধন যেরূপ অবলীলাক্রমে ছিন্ন করা যায়, তারা সেইরূপ

শম্ভূজীর বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, শম্ভূজী, এখন আর কাহাকেও মন্দ কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। তোমাকে অনেকবার অপমান করিয়াছি, এখন আর তোমায় কিছু বলিব না। তুমি এখনি দূর হও, আর কখন আমার গৃহ অপবিত্র করিও না।

শম্ভূজীও আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারার কথায় কিছু না বলিয়া কিয়ৎকাল নীরবে রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি কি আমার কথায় কাণ দিবে না? আমায় কি কোনমতে বিবাহ করিবে না?

তারার চক্ষে ঘৃণা জ্বলিতেছিল। কহিল, তাহা কি তুমি আজ জানিলে?

শম্ভূজী আবার জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে বিবাহ করিবে না?

তারা কুপিত হইয়া কহিল, শীঘ্র দূর হইয়া যাও, নহিলে অন্য উপায়ে তাড়াইব।

তখন শম্ভূজী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা অন্তিমকালে একখানি দানপত্র লিখাইয়াছিলেন, জান?

তারা কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কহিল, না।

এই সময় শম্ভূজী তারার প্রতি বিষময় কটাক্ষ করিতেছিল; পথিকের স্কন্ধদেশে লম্ফ প্রদান করিবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্র যেরূপ তাহার দিকে চাহিয়া থাকে সেইরূপ চাহিয়াছিল।

তারার কথায় অন্য উত্তর না দিয়া শম্ভূজী বস্ত্রমধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিল। সেইখানি তারার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, এই সেই দানপত্র। ইহার দুইজন সাক্ষী বর্ত্তমান আছে। পত্রের মর্ম্ম অবগত আছ?

তারা কহিল, না।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেরূপ নিঃশব্দে লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে থাকে, নিঃশব্দে সন্নিহিতআশঙ্কাজ্ঞানশূন্য পথিকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শম্ভূজী সেইরূপ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, এ দানপত্রের কথা কখন শুন নাই?

তারা। না।

শম্ভূজী। এই লও, একবার দেখ, ইহাতে কি লেখা আছে।

তারা। আমি পড়িতে জানি না।

শম্ভুজী। এ দানপত্রে কি লেখা আছে, শুনিতে চাও?

তারা। বল।

শ। তোমার পিতা এই দানপত্রে লিখাইয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যে যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, ত তোমাকে সমুদয় পৈত্রিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

তারা ভাল করিয়া শম্ভুজীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল, দেখ, শম্ভুজী, তোমরা কেহই আমাকে এ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিলে না। দানপত্র যে লিখাইয়াছিল, সেও আমাকে চিনিতে পারে নাই, তুমিও আমাকে চিনিতে পার নাই। এই তুচ্ছ সম্পত্তির জন্য তোমার মত ঘৃণিত অধমকে বিবাহ করিব? এতদিন পর্ব্বতে বাস করিলাম, আর এখন পারিব না? এ গৃহ, এ বিষয় সব তোমার রহিল। আমি চলিলাম, আর এ গৃহে প্রবেশ করিব না।

শম্ভুজী তারার চরণে নিপতিত হইয়া, দুই হাতে তাহার চরণ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত করিয়া, ভগ্নস্বরে কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাইও না। আমি কেবল তোমাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তুমি গেলে আমি তোমার বিষয় লইয়া কি করিব? এখানে থাকিলে তবু তোমাকে দেখিতে পাইব। এই দেখ, আর তোমায় ভয় দেখাইতে পারিব না।

এই বলিয়া তারার চরণ ত্যাগ করিয়া দানপত্র ছিন্ন ছিন্ন করিয়া সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিল।

শম্ভুজীর ধূল্যবলুণ্ঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া তারার দয়া হইল। কহিল, শম্ভুজী, উঠিয়া বাড়ী যাও। আমি এ সকল কথা ভুলিয়া যাইব, কিন্তু তুমি আর ভবিষ্যতে এরূপ বালকের ন্যায় আচরণ করিও না। আর কখন বিবাহের উল্লেখ করিও না।

শম্ভুজী উঠিয়া বাড়ী গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর কয়েকদিন শম্ভুজী আর আসিল না। একদিন সে একটা বড় খবর লইয়া আসিল। তারা যে গৌরীকে দেখিয়াছিল, শম্ভুজী তাহা জানিত না। কহিল, একটা ছোট রকম মেলা হইবে। স্থানটা সেতারা ও নয় ভীলপুর ও নয়, মাঝামাঝি একটা জায়গা। সেখানে গৌরী নিশ্চয়ই যাইবে। সেইখানে গিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া আসিলে হয় না?

গৌরীকে তারা একবার দেখিয়াছিল, শম্ভুজী তাহা জানিত না। শম্ভুজীর কথায় তারা কোন উত্তর না দিয়া আপনার মনে ভাবিতে লাগিল। শম্ভুজী মনে করিয়াছিল একটা মস্ত খবর আনিয়াছি। এরূপ গতিক দেখিয়া চলিয়া গেল।

তারা ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা স্থির করিল। পূর্ব্বেকার মত এখন আর তাহার বেশভূষার তেমন পারিপাট্য নাই। মলিন বেশ, মলিন কেশ, মলিন মূর্ত্তি। মেলার দিনে তারা যত্ন করিয়া অঙ্গরাগ করিল; অতি বিচিত্র বহুমূল্য বসন পরিধান করিল; কেশ সযত্নে রঞ্জিত করিল; কাণে সোনা পরিল; অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরিল; নয়নে কজ্জল পরিল; অধরে তাম্বুল দিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া মহাদেবকে সঙ্গে করিয়া মেলা দেখিতে গেল।

মেলার একস্থলে কতকগুলি স্ত্রীলোক জড় হইয়াছিল। তাহাদের সুবিধার জন্য পুরুষেরা তাহাদিগকে সেই দিকটা ছাড়িয়া দিয়াছিল। মধ্যস্থলে একটু উচ্চ স্থান; সেখানে বসিবার বেশ সুবিধা। সেইখানে গৌরী বসিয়াছিল, তাহার পার্শে একজন বৃদ্ধা। তারা মহাদেবকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে গেল। তাহাকে দেখিয়াই, চারিদিকে কাণাকাণি, গা টেপাটিপি, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, ঐ বুঝি রঘুজীর কন্যা! লজ্জা নেই সরম নেই পুরুষ মানুষের মতন হুট্ হট

কোরে বেড়াচ্চে। আর একজন কহিলেন, মাগীর ঠ্যাকার দেখ! টাকার গুমুরে ফাট্‌চেন! কাপড় রে, গহনা রে, গায়ে আর ধর্‌চে না। তবু যদি অমন বাপের মেয়ে না হতিস্! অপর একজন কহিলেন, বাবা, এমন মেয়ে সাত জন্মে দেখি নি। হন্ হন্ কোরে আস্‌চে দেখ। আগে কত গুণবতীই ছিলেন, এখন নাকি একটু তবু ভাল হয়েচে। জাতসাপের বংশ,—আবার কোন্ দিন ফোঁস কোরে ওঠে দেখ।

এইরূপ নানা কথা চলিতেছে, এমন সময় তারা তাহাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। অমনি সকলে চুপ, যেন কেহ তাহাকে চেনেই না, যেন কেহ তাহার ছায়াই মাড়ায় নাই! একজন পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার কাণে কাণে বলিয়া দিল, যদি কেউ তোমাকে উঠিতে বলে, কখনো উঠিও না। আর একজন গৌরীর গা টিপিয়া দিল, তুমি প্রাণান্তে নড়িও না।

সমবেত স্ত্রীলোকেরা তারাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সে একেবারে যেখানে গৌরী ও বৃদ্ধা উপবেশন করিয়াছিল, সেইখানে গেল। গৌরী তাহাকে ভ্রমেও চিনিতে পারিল না। পর্ব্বতের সে চীর-পরিহিতা, কালিমাময়ী, জটাধারিণী মূর্ত্তিতে আর এই গর্ব্বিতা সুন্দরী যুবতীতে অনেক প্রভেদ। তারা গৌরীকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধতস্বরে কহিল, এ স্থান তোমাদের জন্য নয়। তোমরা অন্যত্র যাও। তোমরা এ স্থলের উপযুক্ত নও।

গৌরী ভালমানুষ, ঝগড়া করিতে চায় না। তারাকে দেখিয়া মনে করিল, দূর হউক, সরিয়া যাই, তাহাতে অপমান কি? ইহাকে দেখিয়া বড়মানুষ বোধ হইতেছে। মিছামিছি ইহার সহিত ঝগড়া করিয়া কি হইবে? সরিয়াই যাই।

এই ভাবিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরীর পাশে যে বুড়ী বসিয়াছিল, সে মাগি বড় কুঁদুলী। তারার কথায় তাহার গা জ্বলিয়া উঠিল। গৌরী উঠিয়া যায় দেখিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। তারার দিকে ফিরিয়া আর এক হাত নাড়িয়া কহিল, কেন গা, তুমি কি রাজার রাণী এয়েচ না কি, যে তোমায় দেখে উঠে যেতে হবে? তুমিও এয়েচ যেমন দেখ্‌তে আমরাও এয়েচি তেমনি দেখ্‌তে। তোমার

খরিদ করা জায়গাও নয় আমার কেনাও নয়। বড় মানুষ আছ, বাছা, আপনার ঘরে আছ। তা, এখানে তোমায় দেখে কেউ সব্‌বে কেন?

তারা, বুড়ীর কথায় কিছু না বলিয়া গৌরীকে বলিল, গ্রামে গোকুলজীর সঙ্গে ঢলাঢলি করিয়া এখানে বসিতে লজ্জা করে না? এ স্থান দুশ্চারিণীর বসিবার জন্য নয়।

গৌরী রাগিয়া কহিল, তোমাকে আমি চিনি না, কোথাও কিছু নাই, তুমি এখানে আসিয়া আমায় মন্দ বলিতেছ, আমায় মিথ্যা অপবাদ দিতেছ। কে তুমি যে আমি তোমায় ভয় করিব? গালি দিলেই গালি শুনিতে হইবে। এই বলিয়া গৌরী আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিল। তাহার কোমল মুখখানি বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

তারা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত গৌরীর হাত টানিয়া সরাইয়া দিল। গৌরী অধোবদনে অজস্র রোদন করিতে লাগিল। রোদন দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের পর চারিদিকে গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া তারা চলিয়া গেল। নারীদল ভয়ে তাহার সাক্ষাতে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। বুড়ী পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিল।

তারা এইজন্যই আসিয়াছিল। মেলায় আসিবার তাহার দুইটী উদ্দেশ্য। প্রথম, গোকুলজীর নেত্রপথে পতিত হওয়া, দ্বিতীয়, লোকের সমক্ষে গৌরীকে অপমান করা। দুই উদ্দেশ্যই পূর্ণ হইল। মেলায় প্রবেশ করিতে গোকুলজীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, গোকুলজী তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইল। সুতরাং কথাবার্ত্তা আর কিছু হইল না। গৌরীকে যেরূপে অপমানিত করিল, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে গোকুলজী এখন একাকী। পাশের ঘরে চারপাই পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহাতে আর বিছানা পাতা নাই। গোকুলজীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। যে সময় তারা পিতৃগৃহে অগ্নি জ্বালিয়া পলায়ন করে সেই সময় বৃদ্ধার কাল হয়।

ঘর দুখানি এখনো পূর্ব্বের মত পরিষ্কার। গোকুলজীর মাতার ঘর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি রহিয়াছে। গোকুলজী নিত্য সব দেখে, স্বহস্তে ঘর ঝাঁট দেয়, পরিষ্কার করে, যেটী যেখানে থাকে যত্ন পূর্ব্বক সেইটী সেইখানে রাখে। বুড়ীর সাজা পান রাখিবার পিতলের একটী ছোট বাটা ছিল, গোকুলজী সেটী প্রত্যহ মাজিয়া রাখে। পানবাটা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহাতে মুখ দেখা যায়। দোক্তা রাখিবার একটী ছোট ঝাঁপি ছিল, তাহার ভিতরে এখনো দোক্তা রহিয়াছে। দিনের বেলা চারপাইয়ের উপর বিছানা দেখিতে পাওয়া যায় না, সত্য; কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গোকুলজী বিছানা পাতে ও প্রাতে তুলিয়া রাখে। বিছানা আগেকার মত ঝর্ ঝরে, পরিষ্কার।

মাতার মৃত্যু হইলে পর কয়েক দিবস গোকুলজী কুটীরের বাহির হইত না। একদিন বাহির হইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। লোকে ভাবিল, মাতৃশোকে বুঝি গোকুলজী গ্রাম ছাড়িল। দুই তিন সপ্তাহ পরে গোকুলজী একটী যুবতী সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। লোকে আবার ভাবিল, গোকুলজী বিবাহ করিয়া আসিয়াছে।

সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকে একটা কিছু মনে করিতে কখন ছাড়ে না। গোকুলজীর সম্বন্ধে লোকে দুইবার দুই রকম মনে করিল, দুইবারই ভুল। গোকুলজী গ্রাম ছাড়িয়াও যায় নাই, সঙ্গিনী যুবতীকে বিবাহ করিয়াও লইয়া আইসে নাই।

গোকুলজীদের গ্রামে একটী কুটীরে এক বিধবা বাস করে। তাহার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না, সে একাই থাকিত। স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধবয়স্কা, প্রাচীনাই বলিতে হয়, তবে নিতান্ত বৃদ্ধা নয়। মাথার চুল বেশী ভাগ কাল, মাঝে মাঝে সাদা চুল দেখা দিয়াছে। চক্ষু ছুটী কাল, কিছু ছোট ছোট। ললাট ও ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দেখিলে বোধ হয় স্ত্রীলোকটী কিছু কোপন-স্বভাবা। বাস্তবিক এই তাহার একমাত্র দোষ নহিলে তাহার আর কোন দোষ ছিল না। পরিশ্রমে অকাতর, প্রতিবেশীদিগের উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এজন্য গ্রামের লোকেরা তাহার অনেক প্রত্যু-পকার করিত।

গোকুলজী, যুবতীকে সঙ্গে করিয়া আপনার কুটীরে প্রবেশ না করিয়া একেবারে সেই বিধবা স্ত্রীলোকটীর কুটীরে গেল। গোকুলজীর সহিত বিধবার পূর্ব্বেই কিছু কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে, কারণ সে গৌরীকে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত না হইয়া কহিল, কি গোকুল, এই মেয়েটী?

গৌরী নিতান্ত মেয়েটী নয়, সে বিধবার কথা শুনিয়া একটু হাসিল।

গোকুলজী উত্তর করিল, হাঁ। কেমন, একে রাখ্‌তে পার্‌বে ত?

বিধবা বলিল, শুন কথা! মানুষের কাছে মানুষ থাকবে তার আবার কথা। এস ত বাছা। এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গৌরীর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। গৌরীও কিছু না বলিয়া তাহার সঙ্গে গেল। গোকুলজী আপনার কুটীরে ফিরিয়া গেল।

বিধবা কয়েক দিনের মধ্যেই গৌরীকে কন্যার মত স্নেহ করিতে আরম্ভ করিল; গৌরীও যথাসাধ্য তাহার সেবা করিত।

মেলার দিন গৌরী ও বিধবা স্ত্রীলোকটী একত্রে মেলা দেখিতে যায়, সেইখানে সর্ব্বজনসমক্ষে তারা নিরপরাধে গৌরীকে অপমান করিল। গৌরী, বৃদ্ধার হাত ধরিয়া অধোবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীরাভিমুখে গমন করিল। বিধবা চীৎকার করিয়া তারাকে গালি পাড়িতে লাগিল।

পথে গোকুলজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। গৌরীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে?

গৌরী কোন উত্তর করিল না, অধোবদনে কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে

লাগিল। তাহার সঙ্গিনী কহিল, সেতারার তারা বাই, রঘুজীর কন্যা, তাকে জান ত? মাগী বিনা দোষে আমার বাছাকে গাল দিয়েচে আর নত্তা ধোরে ফেলে দিয়েচে। দর্পহারী মধুসূদন আছেন, মাগীর দর্প চূর্ণ হবে হবে হবে!

সেই পথের ধারে দাঁড়াইয়া, গোকুলজী একটী একটী করিয়া সব কথা শুনিল। তখন, তাহার নির্ম্মল ললাট অন্ধকার হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর স্ফুরিল, চক্ষে বিদ্যুৎ ঘনীভূত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি কখনও তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই। একবার তাহার পিতার সহিত বিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কন্যার রাগ হইবার কোন কথা ছিল না। সে আমাকে নিজে বলিয়াছিল যে তাহার কিছু রাগ হয় নাই, দুই একবার আমার সঙ্গে মিষ্ট কথাও কহিয়াছিল। এখন তাহার অন্তরের গরল প্রকাশ করিতেছে। গৌরী, পর্ব্বতবাসিনীকে মনে পড়ে?

গৌরী রোদন ভুলিয়া সাশ্চর্য্যে কহিল, পড়ে বই কি!

গোকুলজী। এই সেই। সেই জটাধারিণী, মলিনাঙ্গী রমণী আর এই ধনগর্ব্বিতা যুবতী, দুই-ই এক। পর্ব্বতপ্রবাসে রঘুজীর কন্যা অনেক দিন কাটাইয়াছিল। তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কেন অসম্মত হইয়াছিলাম, এখন কি তাহা বুঝিলে?

গৌরী। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গো। আজ তাহার আচরণ দেখিলে ত? আমি তাহার কিছু করি নাই, অথচ সে আমার পরম শত্রু। সে মনে করিয়াছে আমরা গরিব, অপমানের শোধ তুলিতে পারিব না। আমাকে কিছু বলিলে, আমি হয়ত কিছু মনে করিতাম না, সহ্য করিয়া যাইতাম। কিন্তু কিছুমাত্র দোষ না পাইয়া এত লোকের সাক্ষাতে যখন তোমার অপমান করিয়াছে, তখন ইহার প্রতিফল দিবই দিব।

গৌ। তা হউক, আমায় অপমান করিয়াছে, করিয়াছে। তুমি কি করিতে কি করিবে, আর কথায় কাজ নাই। আর মেলা দেখিতে না গেলেই হইবে। তুমি রাগের মাথায় কি করিয়া বসিবে, তার ত ঠিক নাই। তোমার পায়ে পড়ি আর কোন গোল কোরো না। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

গো। না, না, সে সব ভয় কিছু নাই। আমি কখন স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিব না। সে যেমন লোকের সাক্ষাতে তোমার মাথা হেঁট করেছে, আমিও তেমনি করিব। কিন্তু তার অঙ্গস্পর্শ করিব না।

এই বলিয়াই গোকুলজী চলিয়া গেল। গৌরী, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, বিধবার সঙ্গে বাড়ী গেল।

দুঃখের জগতে আরও দুঃখ এই। তুমি আমার মন বুঝ না, আমি তোমার মন বুঝিতে পারি না। গোকুলজী তারার মন জানিল না। কেন যে তারা গৌরীর অপমান করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। তারা যথার্থ গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী। কিন্তু সে অপরাধ যে কেন করিয়াছিল, গোকুলজী তাহা একবার বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল না। তারা যে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী, গোকুলজী আর কাহারও প্রণয়াসক্ত হইবে, ইহা তাহার প্রাণে সয় না, এই কারণেই যে গৌরীকে অপমানিত করিয়াছিল, তাহা আর কেহ জানিতে পারিল না। যে গোকুলজীর জন্যই তারা অকারণে অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই গোকুলজীই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

দুইটী মানুষ, একে অপরের জন্য গঠিত, পরস্পরের প্রতি স্বতঃই আকর্ষিত হইবে। আবার দেখিবে, সহসা তাহাদের মধ্যে এমন এক ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে পরস্পর আকৃষ্ট না হইয়া, অন্তরিত হয় ও ক্রমশঃ ভিন্ন মুখে গমন করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যবধান ঘটিতে ঘটিতে অকস্মাৎ তাহারা আর একস্থলে গিয়া মিলিত হয়। যেখানে মিলিবার কথা, হয় ত ঠিক তাহার বিপরীত স্থানে মিলন সংঘটিত হয়। যাহাদের ইহজীবনেই মিলন হইবার কথা, তাহারা হয় ত মরণে মিলিত হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিবস প্রাতঃকালে মহাদেব গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিয়াছে, এমন সময় গোকুলজী গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাদেব ব্যস্তসমস্ত ভাবে এদিক ওদিক করিতেছে, কখন ঘরের ভিতর যাইতেছে, কখন বাহিরে আসিতেছে, একটা ভৃত্যকে তিরস্কার করিতেছে, আর একজনকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। গোকুলজী হাসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, মহাদেব চিনিতে পার?

মহাদেব ফিরিয়া গোকুলজীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, কে গোকুলজী? তোমায় আর চিনিতে পারিব না? কোথা থেকে হে? আজ বড় ভাগ্য। এস, এস!

এই বলিয়া বৃদ্ধ গোকুলজীর হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যে বসাইল। গোকুলজী হাসিতে হাসিতে কহিল, মহাদেব, তুমি আমাদের যেমন শুভানুধ্যায়ী, তাহাতে তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা শুনা করা আমার কর্ত্তব্য। আগে তুমি আমাদের বাড়ী যেতে আস্‌তে, এখন ত আর যাও না। তা, এখন কার কাছেই বা যাবে?

এই বলিয়া গোকুলজী মস্তক অবনত করিল।

মহাদেব। ভাল মন্দ ত সকলেরই আছে, গোকুলজী। তোমার মার বয়স ও হয়েছিল। তোমার কি চিরকাল শোক করা উচিত?

গোকুলজী। না, তাই এতদিন তোমার কাছে আসিতে পারি নাই। তা নহিলে আরও আগে আসিতাম। তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই হয়। কিন্তু এ বাড়ীতে আসিতেও বড় সাহস হয় না। রঘুজীর কন্যা রাগ করিতে পারেন।

ম। সে কি? কেন রাগ করিবে? তুমি তারার কি করিয়াছ?

গো। কিছু করি নাই। তবে সেই যে একবার রঘুজীর সঙ্গে ঝগড়া

মারামারি হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেইজন্য যদি কিছু মনে করিয়া থাকেন।

মহাদেব হাসিয়া উঠিল। কহিল, তবে তুমি তারাকে চেন না। আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তারা তোমার কিছু বলিবে! সে তেমন মেয়ে নয়।

অন্য গৃহ হইতে কে ডাকিল মহাদেব, কোথায় তুমি?

মহাদেব উত্তর করিল, এই যে আমি।

যে ডাকিতেছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিল। কহিল, আমি তোমায় বাহিরে খুঁজিয়া পাইলাম না। আজ যে তুমি বড় ঘরের ভিতর বসিয়া আছ? কিছু অসুখ করিয়াছে না কি?

মহাদেব। না। এই গোকুলজী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাই ইঁহাকে ঘরে বসাইয়াছি। তুমি কি ইঁহাকে চেন না?

চেনে না? তারা গোকুলজীকে চেনে না? চন্দ্র সূর্য্যকে চেনে না? ফুল ভ্রমরকে চেনে না? চিরদরিদ্র চিরাকাঙ্ক্ষিতকে চেনে না! কথা শুন! যাহাকে ভাবিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহাকে আমি চিনি না! যে জীবনের কেন্দ্রস্থান, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবনের চক্র ঘুরিতেছে, তাহাকে চিনি না! হৃদয়ের সন্ধ্যাকাশে যে একটী মাত্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে, সে নক্ষত্র আমি চিনি না!

সেই গোকুলজী আজ তারার গৃহে পদার্পণ করিয়াছে, আজ সে তারার ঘরে বসিয়াছে। আর তারা তাহাকে চিনিবে না? আজ ত সে গোকুলজীকে নিকটে পাইয়াছে। আজ সে কেন তাহাকে আত্ম সমর্পণ করুক না? তাহার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলুক না কেন,—জীবিতেশ্বর, আমি তোমাকে মনে মনে বরমাল্য দান করিয়াছি, তুমি আমার স্বামী। বিধাতা আমাদিগকে পরস্পরের তরে নির্ম্মিত করিয়াছেন। তুমি আমাকে বিবাহ কর। লোকে যাহা বলিতে হয় বলুক। তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি? আজ তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ। তোমাকে কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিব, তোমাকে কি করিয়া সমাদর করিব? তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমাকে আমার জীবন সর্ব্বস্ব দিব, গ্রহণ কর।

তারা ত এ সব কথা বলিল না। কেন?

গোকুলজী যে তাহাকে চায় না। সে যে অন্যের প্রণয়ী।

তবে তারা কি বলিবে? চুপ করিয়া থাকিবে? তাও কি থাকা যায়? তবে কি বলিবে, গোকুলজীকে চিনি না? ছি! মিথ্যা বলিবে? তারা বলিল, চিনিব না কেন?

মহাদেব বলিতে লাগিল, গোকুলজী কেমন লোক, তা তোমায় বলিয়া থাকিব। সম্প্রতি ইঁহার মাতার কাল হইয়াছে। ইনি এ বাড়ীতে কখন আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন।

তারা এখন কথা খুঁজিয়া পাইল, কহিল, তা বেশ ত, উনি যদি আমাদের বাড়ী কখন কখন আসেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা।

মহাদেব কহিল, আমি ও তাই বলিতেছিলাম।

এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল, মহাদেব!

মহাদেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া তারাকে কহিল, তুমি একটু গোকুলজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, আমি এখনি আসিতেছি। বাহিরে ক্ষেতের লোক আমায় ডাক্‌চে।

মহাদেব উঠিয়া গেল। সে লোকের সাক্ষাতে তারাকে "তুমি" বলে। নির্জ্জনে আদর করিয়া "তুই" বলিত।

ঘরে রহিল কেবল তারা আর গোকুলজী। এইবার বিষম বিপদ। কে কি বলিবে? কে আগে কথা কহিবে? তারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দেখিয়া গোকুলজী কথা কহিল, বলিল, পর্ব্বতে যখন তোমার সহিত দেখা হইয়াছিল, তখন তোমাকে অনর্থক মন্দ কথা বলিয়াছিলাম। সে অপরাধ কি মার্জ্জনা কর নাই?

তারা। কি মার্জ্জনা করিব? তুমি আমায় যে কথা বলিয়াছিলে, গ্রামশুদ্ধ লোকে সে সময় আমায় সেই কথা বলিতেছিল। বরং আমি যে তোমায় দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলাম, সেজন্য আমার মার্জ্জনা চাওয়া উচিত।

গোকুলজী। অমন কথা বলিও না। তুমি যে আমায় কোন মন্দ কথা বলিয়াছিলে, তাহা ত স্মরণ হয় না, বরঞ্চ আমাদের খুব যত্ন করিয়াছিলে তাহাই মনে পড়ে।

তারা কথা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বিবাহ কবে হইল? বলিতে কিছু আপত্তি আছে কি?

গোকুলজী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি? আমার বিবাহ—কৈ আমার ত বিবাহ হইবার কোন কথা নাই। সে সম্বন্ধে যদি কিছু শুনিয়া থাক, সব মিথ্যা কথা। আমি সত্য বলিতেছি আমার বিবাহের এখন কোন সম্ভাবনা নাই। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিবে, কিছু বিশ্বাস করিও না। সব মিথ্যা কথা।

তারার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইল। তাহার ভয় হইল, পাছে হৃদয়ের কোলাহল গোকুলজী শুনিতে পায়। সেই ভয়ে বস্ত্রের মধ্যে হস্ত দিয়া হৃদয় চাপিয়া ধরিল। অনেক ক্ষণ পরে তাহার কণ্ঠস্বর ফিরিয়া আসিল। তখন সে অতি মৃদু স্বরে, মস্তক উত্তোলন না করিয়া, কহিতে লাগিল, গোকুলজী, আমি আর একটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমার এখন স্মরণ হইতেছে—

গো। কৈ—না? তুমি ত আমার কিছু অপকার কর নাই।

তারা। আমি একদিন বিনাদোষে গৌরীকে অপমান করিয়াছিলাম—

গো। আমি ত তা জানি না। আর স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে সামান্য একটা ঝগড়া হইলে আমাদের ত জানিবার আবশ্যক নাই। গৌরীর সহিত তোমার ঝগড়া হইলে আমি রাগ করিব কেন? সে আমার কে?

গোকুলজী মিথ্যা বলিল। সে আজ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলে নাই। আজ সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মিথ্যা কথা কহিল। গোকুলজীর মনে কি ছিল, তাহা জানিলে তারা তাহাকে দেখিয়া কখন এত আনন্দিত হইত না।

তারা আর কিছু বলিল না। তাহার হৃদয়ে আনন্দ উথলিতেছিল।

মহাদেব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গোকুলজীকে কহিল, গোকুলজী, অনেক বেলা হইয়াছে, ভীলপুর এখান হইতে অনেক দূর। আজ এইখানে আহার কর।

গোকুলজী কহিল, না, বাড়ী যাই। আমাদের একটু অবেলায় আহার করিলে কোন অপকার হয় না।—এমন সময় তারার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল,—অমনি মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিল, তা তুমি যদি বল, ত এখানেই আহার করি।

গোকুলজী আহার করিয়া মহাদেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তারাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। বৈকাল বেলা গোকুলজী তারার সহিত দেখা করিয়া গেল। গমনকালে বলিয়া গেল, পারি ত কাল আসিব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোকুলজী চলিয়া গেলে মহাদেব তারাকে কহিল, দেখ্ তারা, আমি ভাবিতেছিলাম কি, যে গোকুলজীর সঙ্গে তোর বিবাহ হইলে বড় সুখের হইত। আমার তা হলে মরণকালে আর কোন দুঃখ থাকিত না। এই কথা তোকে আর একবার বলেছিলেম, না? তা বিয়ের কথা বল্লেই ত তুই রাগ করিস্। এদিকে গোকুলজীর ও না কি আর এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েচে?

তারা। সব মিথ্যা কথা। গোকুলজী আজ আমাকে নিজে বলেচে, যে তার বিয়ে হবার কোন কথা নাই। লোকে কেবল মিথ্যা রটায়।

মহাদেব তারার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তোর সঙ্গে বিয়ে হবে না কি?

তারা। তুমি কেবল ঐ কথাই বল। গোকুলজীর বিবাহ হয় নাই বলিয়াই কি আমার সঙ্গে বিবাহ হইবে? তোমার যেমন কথা।

এবার ত তারা রাগ করিল না। আর একবার তারাকে এই কথা বলাতে সে হাসিয়াছিল। তবে কি তারা গোকুলজীকে ভাল বাসে? মহাদেব ভাবিতে লাগিল। বুড় মানুষ, কত কথা মনে আসে, কত কথা মনে আসে না। এ কথাটা ভাবিতে সে কথাটা ভুলিয়া যায়। মাথামুণ্ড, ছাইভস্ম, আপনার মনে কত কি ভাবিল। ভাবিয়া স্থির করিল, তারা গোকুলজীকে ভাল বাসে। তাহার পরেই স্থির করিল, ইহাদিগের বিবাহ দিব।

আর তারা? সে কি ভাবিতেছিল? সে এইমাত্র বুঝিল যে হৃদয়ের মধ্যে

আনন্দের বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। হৃদণ্ড হুসিয়া যে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবে কি দুঃখ ছিল, কি দুঃখ নাই, কিসের জন্য এত আনন্দ, তাহার সে ক্ষমতা রহিল না। শুষ্ক হৃদয়, তাহাতে বিন্দু বিন্দু জল সেচন করিবারও উপায় ছিল না। সে হৃদয় মরুভূমির তুল্য হইয়া উঠিতেছিল। সেই হৃদয়ের মধ্যে সহসা অতি বেগে বন্যা ছুটিল। সেই বন্যা সব ডুবাইল, সব গ্রাস করিল। চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আর থাকে না। দিন দিন দৃষ্টির হ্রাস হইতেছে, অবশেষে চক্ষে আর আলোক প্রবেশ করে না। এমন সময় অকস্মাৎ অন্ধতা ঘুচাইলে কি হয়? সূর্য্যরশ্মি যে চক্ষে অনেক দিন প্রবেশ করিতে পায় নাই, সে চক্ষে অকস্মাৎ সূর্য্যের আলোক পতিত হইলে, চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিষাদের ভাবনায় এক রাত্রির মধ্যে কৃষ্ণকেশ শুভ্রবর্ণ হইতে শুনা গিয়াছে। অভাবনীয় আকস্মিক আনন্দের আতিশয্যে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াছে, এরূপ শুনা যায়। যাহার হৃদয় আনন্দপরিপ্লুত, সে চিন্তা করিবে কিরূপে? গভীর নিশীথে স্বপ্নবশে কেহ যেমন মুদ্রিত নয়নে ভ্রমণ করে, তারার সেইরূপ মোহজনিত অবস্থা উপস্থিত হইল। কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিলে যেরূপ বিকলচিত্ত ও বিকলাঙ্গ হওয়া যায়, তারার ঠিক সেই দশা হইল। চলিতে পা টলে, ভাবিতে মাথা টলে। মৃতপ্রায় আশা পুনর্জ্জীবিত হইয়া তারাকে পাগল করিয়া তুলিল। হর্ষসমুদ্রে তরঙ্গ দোলায় তাহাকে দোলাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রবণে পশিতেছিল,—বহুদূরশ্রুত ভগ্নকণ্ঠ রোদন সঙ্গীত, এখন যেন হৃদয়ের মধ্যে কে শ্রুতিহর মধুর গীত গায়িল। আকাশে চন্দ্র হাসিল। সঙ্গীতে মাদকতা আছে, প্রেমে মাদকতা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা আশাভাও মাদকতাময়। সে নেশা কখন ছাড়ে না। তারা সেই পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিল। গোকুলজী আর কাহারও নয়। সে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। আজ সে তারার বাটীতে আসিয়াছিল, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে,—আর,—আর সে বলিয়াছে, আবার আসিবে।—তাহাতে কি হইল? কি হইল?—শুন, আশা কি বলিতেছে। সে বলিতেছে সব হইল, গোকুলজী তারার হইল, গোকুলজী ত তারারই হইয়াছে। কি হইল? কি হইল না? আবার কল্পনাকে জিজ্ঞাসা কর। সে বলে আমিই সুখ।

পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বাহিরে যাহা কিছু সুখ আছে, তাহা আমারই ভাণ্ডারে। মানুষে আর যাহা কিছু সুখ পায়, তাহা আমার উচ্ছিষ্ট মাত্র। আমিই সুখের সার, বাকী সুখ নীরস। যদি প্রকৃত সুখ চাও ত আমাকে ভজ। তবে মায়াময়ি, তোমার ইন্দ্রজাল দেখাও, তারাকে মুগ্ধ কর। তারা অসংযতচিত্ত, হৃদয়ে অপ্রতিহত প্রণয়ের লীলাময়ী লহরী। মরাল মরালী স্বর্ণসরোবরে ভাসিতেছে। আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, তাহার নিকটে একটী নক্ষত্র। দুই একখানি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বাতাস ঘুমন্ত গাছ গুলির মাথা নাড়িয়া দিতেছে, আর তাহারা বিরক্ত হইয়া মর্ মর্ করিতেছে। জীবন আর মৃত্যু এই এক মুহূর্ত্তে মিশিয়া গিয়াছে। জীবনরাজ্যের শেষ সীমার পর মরণরাজ্যের আরম্ভ। এখন সে সীমা আর অনুভব করা যায় না। এই এক মুহূর্ত্তে জীবন মৃত্যু সমান, সুখ দুঃখ সমান, স্বর্গ নরক থাকে না। সর্ব্বত্রই স্বর্গ, সর্ব্বত্রই জীবন, সর্ব্বত্রই সুখ। তারার চক্ষে ঘুম নাই। এত সুখের ভার বুকে করিয়া নিদ্রা হয় না। এ সুখ রাশির কিছু বিলান চাই। তাই তারা বিনিদ্র নয়নে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর হৃদয়ে আপনার সুখের স্রোত ঢালিতেছে। রজনীর মত এমন রহস্য সখী আর কোথায়? দুঃখের কথা বল, চুপ করিয়া শুনিবে, কিছু বলিবে না, কেবল তোমার নিশ্বাসের সহিত আপন নিশ্বাস মিশাইবে। সুখের কথা বল, নীরবে হাসিবে। নিশীথের কাণে কাণে মনের সব কথা বল, কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। সে সব কথা আর কেহ জানিবে না। মহা সমুদ্রে সহস্র সহস্র নদ, নদী, ক্ষুদ্র তটিনী, সলিলধারা ঢালিতেছে। সে জলরাশি সমুদ্র নিজগর্ভে ধারণ করিতেছে। কোন কথা কয় না, সমুদ্রতীর কখন উদ্বেলিত হয় না। মানুষের সুখ দুঃখের, ভাবনা চিন্তার, পাপ পুণ্যের, এইরূপ আরও লক্ষ লক্ষ স্রোত রজনীর গর্ভে মিশাইয়া যায়। রজনী সমুদয় আপনার গর্ভে ধারণ করে। নির্ম্মল, অমৃত সলিলই হউক অথবা লবণাক্ত গরল ধারাই হউক, হাস্যের লহরীই হউক অথবা রোদনের অশ্রুই হউক, নিঃশব্দে রজনী সমস্তই আপনার বিশাল প্রশান্ত গর্ভে ধারণ করে।

প্রেম তুচ্ছ সামগ্রী নয়। প্রেমে পৃথিবী, প্রেমে স্বর্গ অনুপ্রাণিত হয়। বিশাল বিশ্বের ধমনীর মধ্যে প্রেমই জীবন। পৃথিবীর মধ্যে যে মুহূর্ত্তে

নরনারী প্রেমে বদ্ধ হয়, যে মুহূর্ত্তে আর এক নবীন দম্পতী মিলিত হয়, সেই এক মাহেন্দ্র ক্ষণ! সে মুহূর্ত্তে নন্দনবনে পারিজাতও মন্দার ফোটে, সে মুহূর্ত্তে নরকে যমদূত পাপীকে তাড়না করিতে বিস্মৃত হয়, হতভাগ্য নরের আত্মা এক মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্রাণ পায়।

কোন মূর্খে বলিয়াছে নারী ভালবাসিতে জানে ইহাই তাহার গুণের চরমোৎকর্ষ নয়? রমণী ভালবাসিতে জানে বলিয়াই অপরাপর মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হয়। ভালবাসাই তাহার মূলমন্ত্র। যে দিন রমণী ভাল বাসিতে জানিবে না, সে দিন চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হইবে, বসুন্ধরা স্তম্ভিত হইবে, নক্ষত্র নিভিয়া যাইবে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিবস গোকুলজী আবার আসিল। মহাদেব মনে করিল সম্বন্ধ পাকাপাকি হইতেছে। এই বিবেচনা করিয়া সে তারা ও গোকুলজীকে একত্রে বসাইয়া, কোন কর্ম্মের ছলনায় নিজে উঠিয়া যাইত। গোকুলজী ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইলে, এক দিন গোকুলজী তারাকে নির্জনে পাইয়া কহিল, তুমি একদিন তোমার বাড়ীর সম্মুখে একটা উৎসব করিয়া গ্রামের লোককে নিমন্ত্রিত কর। যুবকেরা ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করিবে, আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিব।

তারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

গোকুলজী প্রণয়ের কোন কথা তারার সাক্ষাতে বলিত না। সে জন্য তারা দুঃখিত নহে। ভাবিত, আজ না হয় কাল একদিন গোকুলজী আমার প্রণয়প্রার্থী হইবেই।

উৎসবের দিন আগত। মহাদেব অনেক ব্যয় করিয়া নানাবিধ আয়োজন করিল। তারা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে স্বয়ং সমাদর করিয়া বসাইল। বালকেরা মাঠে খেলা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা আর একদিকে বসিল। গৌরী আসে নাই, সে ভীলপুরে বৃদ্ধার কুটীরে বসিয়াছিল। তাহার নিমন্ত্রণও হয় নাই।

গোকুলজী প্রাতঃকালে আসিয়াই বরাবর তারার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। তাহা দেখিয়া যুবকেরা আপনাআপনি অনেক বিদ্রূপ করিতে লাগিল। একজন বলিল, গোকুলজী হুঁসিয়ার লোক কি না। গৌরীকে বিবাহ করিলে ত অর্থলাভ হইবার কোন আশা নাই। তারাকে বিবাহ করিলে অর্থচিন্তা আর থাকিবে না। তাই সে এখন তারাকে বিবাহ করিবার ফিকির করিতেছে। আর একজন কহিল, তারাও বুঝি স্বয়ম্বরা হইয়াছে। দেখ না, গোকুলজীর দিকে কেমন চাহিয়া আছে।

তারার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিল। এত লোকের সাক্ষাতে গোকুলজী অনবরত তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে, লোকে যে তাহাতে মন্দ মনে করিতে পারে, এ জ্ঞান তাহার ছিল না। সে আনন্দে অধীর, ভাবিতেছিল গোকুলজী যখন তাহার নিকটে রহিয়াছে, তখন তাহাদের মিলন হইবেই। লোকে দেখিলই বা?

শম্ভুজী সব খবর রাখে। তারার বাড়ীতে ইদানী যাতায়াত পরিত্যাগ করিয়াছিল। আজ সেও এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সব দেখিতেছিল।

অপরাহ্নে ব্যায়াম ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সে সময় গোকুলজী নানাবিধ আশ্চর্য্য ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে চমৎকৃত করিল। তারাও হর্ষবিকসিত চক্ষে চাহিয়াছিল।

ক্রীড়া সমাপন করিয়া গোকুলজী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তারার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই তারাকে উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল তারা, তুমি কি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবে?

তারা লজ্জায় অধোবদন হইল। অস্ফুটস্বরে কহিল, এত লোকের মাঝখানে?

গোকুলজী পূর্ব্ববৎ স্পষ্টাক্ষরে কহিল, এত লোকের মাঝখানে হইলই বা ? ইহাতে আবার লজ্জা কি ? আমার কথার উত্তর দাও।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল।

তখন তারা প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে গোকুলজীর চক্ষের দিকে চাহিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, আমি তোমায় যে দিন দেখিয়াছি সেই দিন হইতে তোমায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি।

ভিড়ের মধ্য হইতে ঠেলাঠেলি করিয়া শম্ভূজী অগ্রসর হইল। চক্ষু কর্ণ ব্যতীত তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তি রহিত হইয়াছিল।

গোকুলজী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল,—কণ্ঠস্বর অতি মুক্ত, সমবেত লোকমণ্ডলী প্রত্যেক অক্ষর শুনিতে পাইল,—কহিল, তবে শোন, রঘুজীর কন্যা। তোমার অর্থ আছে, এজন্য তুমি মনে করিয়াছ যে দরিদ্রের অপমান করিলে, সে অপমানের কেহ প্রতিশোধ লইবে না। সেই সাহসে, ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া তুমি বিনাপরাধে সর্ব্বসাক্ষাতে গৌরীর দারুণ অপমান করিয়াছিলে। এখন শোন। তুমি ধনবতী, আমি দরিদ্র। তুমি আমাকে অযাচিত প্রেম দান করিতেছ, আমাকে মাল্য দিতে স্বীকৃত আছ। আমি তোমায় পরিগৃহীত করিব না। নিরপরাধিনী অবলার ঘোর অবমাননা করিয়াছিলে। সে ভ্রমেও তোমার কোন অপরাধ করে নাই। আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ হইল। আমি তোমার প্রণয় চাহি না। তুমি আমার উপযুক্ত নও। আমার কথার এত লোক সাক্ষী। তোমার প্রেম ভবিষ্যতে যে চাহিবে তাহাকে অকাতরে বিতরণ করিও।

তীব্র ব্যঙ্গের মর্ম্মচ্ছেদী কণ্ঠস্বর দূর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া নীরব হইল। গোকুলজী নিজগ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল।

অনাহূত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা তারার প্রণয়প্রার্থী হইয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, তাহারা গোকুলজীর কথা সমাপ্ত হইলে হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিল, বাহবা, গোকুলজী! আচ্ছা বলিয়াছ! থোঁতা মুখ আচ্ছা ভোঁতা হয়েচে।

গোকুলজী দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

মহাদেব ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে গোকুলজীর অনুসরণ করিল। তাহার ইচ্ছা গোকুলজীকে মনের সাধ মিটাইয়া তিরস্কার করে। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

তারার মাথা ঘুরিয়া আসিল। নিকটে এমন কোন অবলম্বন ছিল না যাহা ধরিয়া দাঁড়াইবে। তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল। বজ্রাহতের তুল্য স্থির রহিল। সেই সময় কে তাহার কর্ণে বলিল, এ অপমানের প্রতিফল আছে।

তারা মাথা তুলিয়া চাহিল। নিকটে আর কোন লোক ছিল না, সকলে প্রস্থান করিয়াছিল। যে দুই চারিজন লোক ছিল, তাহারাও ক্রমে চলিয়া গেল। তারার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শম্ভুজী বলিতেছিল, এ অপমানের প্রতিশোধ আছে।

তারা শম্ভুজীকে দেখিতে পাইল। শম্ভুজী দেখিল, তারার মুখ পাংশুবর্ণ, চক্ষের জ্যোতি নিভিয়া গিয়াছে। তারা তাহার কথা শুনিতে পাইল না, দেখিয়া শম্ভুজী আবার কহিল, এ অপমানের কি প্রতিশোধ নাই?

তারার মস্তকে, হৃদয়ে সহস্র নরকজ্বালা, চক্ষের সম্মুখে নরক নৃত্য করিতেছিল। নরক হইতে কে আসিয়া তাহার কাণে কাণে কহিল, এ অপমানের একমাত্র প্রতিবিধান আছে।

শম্ভুজীকে দেখিয়া তারার শিরার মধ্যে রক্তস্রোত বেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার মুখ অন্ধকার করিয়া তুলিল। চক্ষে একবার মাত্র লোহিত বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল।

তারা কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। শোণিতস্রোতে স্বর

রুদ্ধ হইল। কণ্ঠ হইতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। মুখমণ্ডল আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল।

সে আবার বাক্যস্ফূর্ত্তির প্রয়াস করিল। এবার কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হইল। ভগ্ন, জড়িত কণ্ঠে কহিল, এ অপমানের এক মাত্র প্রতিশোধ আছে।

শম্ভুজী আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি উপায়ে?

তাহাদের অঙ্গস্পর্শ হইল।

তারা কহিল, যে মুখে আমার অপমান করিয়াছে, সেই মুখ চরণ-তলে দলিত করিতে পারি, তাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া কুক্কুরকে খাওয়াইতে পারি, আর তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া গৌরীর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে পারি, তবেই আমার এ অপমান ভুলিতে পারিব। নহিলে বৃথাই জীবন। গোকুলজী জীবিত থাকিতে আমার শান্তি নাই।

শম্ভুজী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কহিল, যে তোমার এ উপকার করিবে, যে গোকুলজীকে নিধন করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?

তারা। তাহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

তখন আশা শম্ভুজীর কর্ণে পৈশাচ মন্ত্র প্রদান করিল। সে কহিল, গোকুলজী আর কখন প্রাতঃসূর্য্যের মুখ দেখিবে না। সে ভার আমার উপর। আমাকে তুমি বিবাহ করিবে?

তারা হস্তোত্তোলন করিয়া কহিল, আমার হৃদয়ের মধ্যে যে নরক জ্বলিতেছে, সেই নরক সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, আমি তোমায় বিবাহ করিব। পূর্ব্বে আমার ভ্রম হইয়াছিল, নহিলে এতদিন তোমাকে বিবাহ করিতাম। আমার এ নরকাগ্নি কোন দিন আমাকেই ভস্মীভূত করিত। এখন আমরা দুইজনে মিলিত হইয়া এ অগ্নিতে হবিঃপ্রদান করিব। গোকুলজী মরুক, তাহার শোণিতে এ অনল নিভাইব।

শম্ভুজী কহিল, আমি শপথ করিতেছি, তোমার পায়ের কাঁটা না তুলিয়া জলস্পর্শ করিব না। তোমাকে লাভ করিবার জন্য সহস্র গোকুলজীর প্রাণ বধ করিতে পারি। তাহাকে আজ রাত্রেই হত্যা করিব। আজ রাত্রেই তোমাকে সে সংবাদ আনিয়া দিব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।

তারা কহিল, ভাল! তুমি যেন সিদ্ধকাম হও।

শম্ভুজী তারাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। তারা তাহাকে নিবারিত করিয়া কহিল, কি ? আমাদের মধ্যে আবার আলিঙ্গন কি? কোমল-হৃদয় নরনারী যাহা করে, আমরাও কি তাই করিব ? ছি! হাত ধর, শপথ কর, গোকুলজীর রক্ত আনিয়া আমার কপালে সিন্দূর পরাইবে।

দুইজনে দুইজনের হাত চাপিয়া ধরিল, দুইজনে পরস্পরের নয়নের ভিতরে দীর্ঘকাল চাহিয়া রহিল, আর কোন কথা কহিল না। দুইজনে মনে মনে শপথ করিল।

তৎকালে সে স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

এই লোমহর্ষণ স্বয়ম্বরের ভয়ঙ্কর পণ আর কেহ শুনিল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম গগনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব সে পণ শুনিলেন। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না। অন্ধকার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে সম্মুখীন করিয়া দিননাথ মুখ লুকাইলেন। নিঃশব্দে সন্ধ্যা আসিল। তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া, আপনার অঞ্চলে নক্ষত্র পূরিয়া যামিনী আসিল। যেমন নিত্য আসে তেমনি আসিল। কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রি। চাঁদ উঠিল না। একটী, দুটী, তিনটি করিয়া তারা উঠিল,—ক্ষীণ, চঞ্চল-জ্যোতি, ছোট ছোট মুখের মত, হারাণ মুখের মত, আশার আলোকের মত, চিরবাঞ্ছিত অস্পৃশ্য প্রিয়জনের মত। জন্মাবধি নক্ষত্র দেখিয়া আসিতেছি, কখন নক্ষত্র স্পর্শ করিতে পাইলাম না। বালকে যাহা দেখে তাহাই স্পর্শ করে, কিন্তু মানুষের এ সাধ কখন মেটে না। নক্ষত্রকুল জগতের পাপপুণ্যের অনন্ত সাক্ষী, তাহারা এ পৃথিবীর সব জানে, আমরা তাহাদের কিছুই জানি না।

নক্ষত্রে যদি কথা কহিতে পারিত, কোটি বৎসর ধরিয়া কি দেখিয়া আসিতেছে, মনুষ্যের অগোচর মানব হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে নিহিত তথ্য সমূহ যদি বলিতে পারিত, তাহা হইলে ইতিহাসে আর মিথ্যা বলিত না। মানবচরিত্র লোকে কেবল কল্পনা করিত না, বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ এরূপ সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিত না।

যামিনী আসিয়া দাঁড়াইল। তুমি যেই হও না কেন, নিশাগমে তোমার স্পষ্ট বোধ হইবে যেন কে তোমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যখন দেখিবে রাত্রি আসিয়া তোমার গাত্রস্পর্শ করিল, অমনি সাবধান হইবে। মনে কোন পাপ চিন্তা আছে? সাবধান, তবে সাবধান! দেখিও যেন রাত্রির পরামর্শে মনোভাব কার্য্যে না পরিণত হয়। প্রদীপ জ্বাল, দ্বার রুদ্ধ কর, নিশীথে কদাচ একাকী বাহির হইও না। বিবেচনাশূন্য হইয়া রজনীর ক্রোড়ে কখন ঝাঁপ দিও না। সে তোমাকে ক্রোড়ে লইবে, অঙ্গে কোমল, সুশীতল হস্ত বুলাইবে, সুবুদ্ধিকে ঘুম পাড়াইবে, দুর্ব্বুদ্ধিকে জাগাইয়া রাখিবে।

তুমি বিষণ্ণমুখি, অভাগিনি, রাত্রিকালে মাথায় হাত দিয়া একেলা বসিয়া ভাবিও না। ছি! উঠ, ঘরে যাও, রাত্রিকালে একান্তে এরূপ একাকিনী বসিয়া থাকিও না। কেহ কিছু মন্দ বলিয়াছে? সে আবার ভাল কথা বলিবে এখন। তুমি কাহার কাছে মনের কথা বলিতেছ? সর্ব্বনাশ! এমন রাত্রির কাছে এমন দুঃখের কথা! অন্ধতামসী নিশি কি তোমাকে চক্ষের জল মুছিতে বলিবে, সে কি তোমায় আশ্বাস প্রদান করিবে? সে কি বলিবে, জান? সে বলিবে নারীজন্মে অনন্ত দুঃখ, তোমার এ দুঃখ ইহজন্মে ঘুচিবে না। সূর্য্যের আলোক দুঃখময়। তুমি আলোকরাজ্য হইতে পলায়ন কর। আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে অনন্ত অন্ধকারে, সুবিস্তীর্ণ নিশারাজ্যে লইয়া যাইব। সে অন্ধকারে তারকা নাই। সেখানে আর তোমাকে এ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না, এ যন্ত্রণাজ্বালা চিরদিনের মত ঘুচিবে। ঘরে একটু দড়ী নাই? না থাকে, বস্ত্রের অঞ্চল ত আছে? রাত্রে মরিও না, লোকে আমার নিন্দা করিবে। সূর্য্যালোকে, নিভৃতকক্ষে, গলায় ফাঁস দিও, আমি তোমায় রাত্রিকালে আসিয়া লইয়া যাইব।

পা টিপিয়া টিপিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে, ঘূর্ণিত আরক্ত চক্ষে, পাণ্ডুর

অধরে নরহত্যাকারী যাইতেছে। মনে করিতেছে, যামিনীই আমার পরম হিতকরী। লুকাও, লুকাও, নক্ষত্রের মুখ ঢাক, পথঘাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন কর, আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তোমার কৃপায় পলায়ন করিব। হস্তে শোণিত লিপ্ত রহিয়াছে। জল পাইলেই হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আবার পলাইব। কেহ আমাকে ধরিতে পারিবে না, কেহ আমাকে বিচারালয়ে নীত করিবে না। প্রভাতকে নিকটে আসিতে দিও না। তোমার জয় হউক, ধরাতলে তোমার অনন্ত রাজ্য স্থাপিত হউক! মূর্খ! পাপে তোমার চিত্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে। আজ যে রজনীর গুণগান করিতেছে, কাল সেই রজনীকে ভয়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ রজনী কিছু বলিতেছে না, কাল তোমায় বিভীষিকা দেখাইবে। কাল তোমার মনের মুকুরে ভীষণ অন্ধকারময় মূর্ত্তি সমূহ প্রতিবিম্বিত করিবে, কাল তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে। মানুষে দেখুক আর নাই দেখুক, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হও আর নাই হও, নিশীথের নির্যাতন এড়াইতে পারিবে না। সহস্র বৃশ্চিক তোমায় দংশিতে থাকিবে। রজনীর অন্ধকার পটে, পরিণামের চিত্র, নরকের চিত্র দেখিতে পাইবে। নিশীথে যমদূতগণ তোমাকে ধরিবার জন্য কৃষ্ণবর্ণ হস্ত প্রসারিবে। তখন সূর্য্যের আলোকের জন্য লালায়িত হইবে, রাজদণ্ডও সুখের বোধ হইবে।

এ আবার কে? দেখ, দেখ! ইহার মনে কোন খলকপট নাই। কোন পাপ ইচ্ছা নাই, ধনমানের আশা নাই, যশ মর্য্যাদার প্রার্থী নয়। একমনে, তন্মনা হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তারা গণিতেছে?—না, তাহার হাতে যে বাঁশী আছে, তাহার কোলে বীণা রহিয়াছে। শোন, নিশীথ বংশীধ্বনি! কদম্বমূলে নিশীথেই বাঁশী বাজিত না—যখন যমুনা উজান বহিত? ওই শোন, আকাশে নক্ষত্র অবনত মস্তকে শুনিতেছে, পৃথিবীতে ফুল মাথা তুলিয়া তাহাই শুনিতেছে, সুপ্ত শিশু স্বপ্নে সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হাসিতেছে। আবার দেখ, বীণা তুলিয়া লইল। বীণার তারে নক্ষত্রকে নক্ষত্রের সহিত বাঁধিতেছে, ফুলকে ফুলের সহিত বাঁধিতেছে, হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত বাঁধিতেছে। তাহার পরে অঙ্গুলির আঘাতে বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গাহিল, 'সব মিশিয়া যাও, কেহ দূরে থাকিও না। সকলে মিলিয়া

একসুরে গান গাও। সব এক, তুই কিছু নয়।' যামিনী সস্নেহে নক্ষত্রহীরকখচিত স্বপ্নবিজড়িত নীল অঞ্চলে তাহার মস্তক আবৃত করিয়াছে।

জ্ঞান চাও? বিশাল বিশ্বের আয়তন পরিমিত করিতে চাও? শতসূর্য্য-তুল্য এক এক নক্ষত্রের ব্যাস, পরিধি জানিতে চাও? সৃষ্টির কতদূর পর্য্যন্ত প্রসার; বিশ্বের পর বিশ্ব, এক সৌরজগতের পর আর এক সৌরজগৎ, পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের পর নীহারিকারূপী অনুমিত ব্রহ্মাণ্ড; যেখানে অন্ধকার অসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে না, আলোকের পদক্ষেপ শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে? আবার এই বিশ্বক্ষেত্রের পতিত ভূমি স্বরূপ চিরান্ধকার অরাজক স্থান কল্পনা করিতে চাও; যেখানে নিয়ম নাই, সমুদয় বিশৃঙ্খলাময়, যেখানে অনু, সূক্ষ্মানু, পরমাণু কখন আশ্লিষ্ট হয় না, অন্ধকারে অবিচ্ছিন্ন বিলোড়িত হইতে থাকে, যেখানে সৃজনের অপূর্ব্ব মন্ত্র কখন উচ্চারিত হয় নাই? কল্পনাকে অভিভূত করিতে চাও? মনুষ্যত্বের গৌরব বর্দ্ধিত করিতে চাও? এই সময় তবে এই সময়। দেখ দেখি, নক্ষত্রে কিছু সাহায্য করে কি না? মৃত্তিকাময় কীটানুকীট ক্ষুদ্র মানব নক্ষত্রের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে কি না? বিশ্বকাব্য-প্রণেতার গ্রন্থ পাঠ করিতে চাও? এই সময় তবে এই সময়।

রজনী গভীরা হইতেছে, স্তরের উপর অন্ধকার স্তর নামিতেছে, অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে। তারা কোথায়?

প্রতিশোধানল কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া সে গোকুলজীর প্রাণ হননে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল। শম্ভুজী তাহার চক্ষে অতিশয় ঘৃণার পাত্র, তথাপি সে অসঙ্কোচে তাহাকে প্রাণি প্রদানে সম্মত হইল।

অথচ সে গোকুলজীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত।

এই কি সেই ভালবাসার ফল? গোকুলজী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইল?

ইহাই নিয়ম। যাহাকে ভাল বাসি তাহার একটী কথাও সহ্য করা যায় না। প্রণয়ের অপমানে যত ক্রোধ হয় এত আর কিছুতে নয়। তারার হৃদয়ের মধ্যে অগ্ন্যুদ্গারী পর্ব্বত লুক্কায়িত ছিল, গোকুলজীর হৃদয়ভেদী অবমা-

ননায় সে পর্ব্বত জ্বলিয়া উঠিল, তরলবহ্নিপ্রবাহে তারা স্বয়ং দগ্ধ হইল, সেই অগ্নিস্রোতে গোকুলজীকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল।

সন্ধ্যা হইলে তারা ভাবিতে বসিল। মহাদেব বুঝাইতে আসিলে তাহাকে ইঙ্গিত দ্বারা নিষেধ করিল। আবার ভাবিতে বসিল, কিছু ভাবিতে পারিল না। আপাদমস্তক কেবল প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রি হইয়া আসিল। তারা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না। জ্বলিতে, পুড়িতে, ভাবিতে লাগিল।

আরও রাত্রি হইল। মহাদেব আহারের জন্য ডাকিতে আসিল। তাহাকে তারা ধমক দিল। সে চলিয়া গেল।

তারা গৃহের বাহিরে আসিল। নিশীথের শীতল পবন তাহার ললাট, কপোল স্পর্শ করিল। সে ভাবিতে লাগিল।

ভাবিতেছিল, গোকুলজী আমার দারুণ অপমান করিয়াছে। আমি তাহার প্রাণ লইব। তাহা হইলে আর কেহ কখন আমার অপমান করিবে না। গৌরী কাঁদিবে, তাহার সে অশ্রুমুখ দেখিলে আমার প্রাণ শীতল হইবে। শম্ভুজী আমার ভর্ত্তা হইবে? তা হইলেই বা? সে যে গোকুলজীকে হত্যা করিবে, তাহার হস্ত যে নরশোণিতে কলুষিত হইবে! তাহাতে তাহার অপরাধ কি? আমিই ত তাহাকে সে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি। আচ্ছা, গোকুলজী মরিলে আমার কি লাভ? লোকে নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করিবে, মনে করিবে আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। লোকে যাহা ইচ্ছা হয় মনে করুক না কেন, আমার তাতে কি? লোকের জন্য যেন নাই ভাবিলাম, নিজের জন্য ভাবিতে হয় ত। গোকুলজীকে মারিলে পরে কি আমার মনে কষ্ট হইবে না? এখনি যখন সাত পাঁচ ভাবিতেছি, তখন পরে না জানি কত মনকষ্টই ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে মারিয়া কি হইবে? সে বাঁচিয়া থাকুক, অন্য কোন উপায়ে এ অপমানের শোধ তুলিব। দূর ছাই! মিছে এ ভাবনা কেন? গোকুলজীকে কে বধ করিবে? শম্ভুজী? ভাল হাসির কথা! শৃগালে সিংহ বধ করিবে! কি জানি, বলা যায় কি? যদি কোন কৌশলে অকস্মাৎ তাহার প্রাণনাশ করে তা ত পারে। যদি নিদ্রিতাবস্থায় তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার

গলায় ছুরী বসাইয়া দেয়! কেন শম্ভুজীকে এমন কথা বলিয়াছিলাম? সে হাসিতে হাসিতে রক্তমাখা হস্তে আমাকে আলিঙ্গন করিবে! তাহার অপেক্ষা গোকুলজীর কাছে শতবার অপমানিত হওয়া ভাল। নরহন্তার সহধর্ম্মিনী, নরহত্যাপাপভাগিনী! জীয়ন্তেই আমাকে যমদূতগণ প্রহার করিবে। শম্ভুজী কোথায়? একবার তাহাকে খুঁজিলে হয় না? সে ত বলিয়াছে আজ রাত্রেই গোকুলজীকে হত্যা করিবে। বোধ হয় আজ পারিবে না। তাহার সহিত যদি দেখা হয় ত তাহাকে নিষেধ করিয়া দিব।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। তারা শঙ্কাশূন্য হৃদয়ে অন্ধকার রজনী মধ্যে একাকিনী বিচরণ করিতে লাগিল।

কোথায় যাইবে? শম্ভুজীকে কোথায় অন্বেষণ করিবে?

শম্ভুজীর গৃহে? সেখানে ত সে নাই।

ভীলপুরের পথে? সেই ভাল, কিন্তু সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা কি?

অন্ধকার রজনী। বসন্তকাল। আকাশময় তারকা। শীতল পবন মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লীরব। গাছগুলা দীর্ঘকায় অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তলায় রাশি রাশি শুষ্কপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারি মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত পথ।

তারা মন্দগমনে চলিল। ভয়ে নহে। শম্ভুজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশা অল্প।

শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মধ্যে কি খস্ খস্ করিয়া উঠিল। নিশাচর সর্প? তারা সরিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইল। কোথায় যেন শব্দ শুনিতে পাইল।

অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, আর কোন শব্দ শোনা যায় না।

অনর্থক দাঁড়াইয়া কি হইবে? আবার চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে পথ হারাইয়া গেল। অনিশ্চিত গতিতে এদিক সেদিক ভ্রমণ করিতে লাগিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। ঝিল্লীরব আর তেমন শোনা যায় না। বাতাস আর একটু শীতল হইল, আর একটু থরথর বহিল। বৃক্ষতলে, বৃক্ষপত্র মধ্যে খদ্যোতিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

তারা উপরে চাহিল। দেখিল, উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘখণ্ড তারার মস্তকের উপর আসিল। তাহার বোধ হইল যেন সে মেঘ আকাশের মধ্যে স্থির হইল।

তাহার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল।

চারিদিকে চাহিয়া বুঝিল, পথ হারাইয়া গিয়াছে। কোথায় আসিয়াছে, ভাল বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ যেন দূর হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল।

তখনও সেই কৃষ্ণমেঘ তাহার মস্তকের উপর অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে।

তারা সভয়ে কহিল, এখানে কোন মনুষ্য আছে?

কোথাও কিছু না। কেবল গভীর স্তব্ধতা।

সম্মুখে পর্ব্বতের অস্পষ্ট রেখা দেখা যাইতেছে। মাথার উপর অন্ধকার বলিয়া ভাল দেখা যায় না।

আর একবার বলিল, কেহ আমার কথা শুনিতেছে?

একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল। নিশীথের শ্রবণে সে কর্কশ স্বর ভীষণ শ্রুত হইল।

মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

তখন তারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, অতি নিকটে নিম্ন গিরিশ্রেণী রহিয়াছে। বুঝিল যে সে স্থান গ্রামের আর এক প্রান্তে স্থিত। সেখান হইতে তারার গৃহ অধিক দূর নয়।

সহসা অতি বিকট কাতর চীৎকার শ্রুত হইল। চীৎকার ধ্বনি পর্ব্বত গহ্বরে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া নিশীথের গর্ভে ডুবিয়া গেল।

আবার চারিদিক ভয়ানক নিস্তব্ধ!

তারার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল। সাহসে ভর করিয়া যে দিকে চীৎকার শুনিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বিপরীত দিক হইতে অন্ধকারে আর এক মনুষ্য মূর্ত্তি অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে সম্মুখবর্ত্তী হইল।

"শম্ভুজী?"

"তারা!"

"এখানে ?"

"তুমি এখানে ?"

"কাহার অনুসন্ধানে ?"

"তোমার।"

"সংবাদ কি ?"

"তুমি আমার।"

এই বলিয়া শম্ভূজী বাহুপ্রসারিত করিয়া তারাকে আলিঙ্গন করিতে আসিল। তারা লম্ফ দিয়া আর এক দিকে দাঁড়াইয়া কহিল,

এখন নয়। কাহার চীৎকার শুনিলাম ?

"যে তোমাকে অপমান করিয়াছিল, তাহার।"

"সে কোথায় ?"

"পর্ব্বত গহ্বরে। সে আর কখন চীৎকার করিবে না।"

তারা পুনর্ব্বার লম্ফ দিয়া দুই হস্তে শম্ভূজীর বাহুর উপরিভাগ দৃঢ়রূপে ধরিয়া, চীৎকার করিয়া কহিল, কি ? সত্য কথা ?

"সত্য কথা। চীৎকার কর কেন ? যদি কেহ শুনিতে পায় ? হাত অত চাপিও না, লাগে।"

"সে কোথায় আছে ? কতদূরে ?" তারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

"গহ্বরের মুখ অতি নিকটে। সে বহুদূরে, ধরণীগর্ভে।"

"আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।"

"সেখানে গিয়া কি হইবে ? কিছু ত দেখিতে পাইবে না। রাত শেষ হইল, চল বাড়ী যাই।"

"তা হউক। বাড়ী খুব কাছে। তুমি আমাকে আগে সেই স্থানটা দেখাও।"

শম্ভূজী তারাকে পথ দেখাইয়া চলিল। পথিমধ্যে তারা কহিল, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সব বল।

"সে অনেক কথা। বিবাহের পর বলিব।

"তুমি এখনি বল। দাঁড়াইয়া শুনিব।"

"তবে শুন। তোমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া গৃহ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইলাম। তাহার পর ভীলপুরের পথে অতি বেগে ধাবিত হইলাম। সে পথে গোকুলজী থাকিলে নিঃসন্দেহ তাহার সহিত দেখা হইত। অর্দ্ধেক পথ চলিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিতে অন্ধকার হইল। তোমার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি, গোকুলজী প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাহসটা একবার দেখ! বোধ হয় তোমাকে আরও কিছু অপমান করিবার অভিপ্রায় ছিল। সেখানে তাহাকে মারিতে সাহস হইল না। একে ত ছুরী লইয়াও তাহার সম্মুখে যাওয়া সহজ নয়, আবার তাহাতে চারিদিকে লোকজন থাকে, চীৎকার করিলে অনেক লোক জড় হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় সে এই দিকে আসিল। আমি ও তাহার অনুসরণ করিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম এমন সুবিধা আর হইবে না। হয় মারিব, না হয় মরিব। আর কেহ দেখিবে না। অনেকক্ষণ কোন সুবিধা হইল না। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, অলক্ষ্যভাবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইতে পারিলাম না। অবশেষে আমি একটা কন্দরের নিকটে বসিয়া বালকের মত মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিলাম। গোকুলজী দ্রুতপদে আমার নিকটে আসিল। ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে গিয়া পৃষ্ঠে ছুরী বিদ্ধ করিলাম। যেমন ফিরিয়া আমার হাত ধরিবে, অমনি ঠেলা মারিয়া তাহাকে পর্ব্বতকন্দরে নিক্ষেপ করিলাম। এই জায়গাটা।"

গহ্বরের মুখ হইতে হাত দশেক অন্তরে দাঁড়াইয়া শম্ভুজী অঙ্গুলি দ্বারা স্থানটা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তাহার পর হাসিয়া কহিল, তারা, আমাদের বিবাহ হইবে কবে?

তারা তৎক্ষণাৎ কহিল, এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে।

"এখন তামাসার সময় নয়। এইমাত্র একটা খুন করিয়াছি।"

"তামাসা নয়। সত্যই বলিয়াছি।"

শম্ভুজী অস্ফুট আলোকে তারার মুখ দেখিয়া বুঝিল, বিদ্রূপ নয়। বুঝিয়া এক এক পা করিয়া পিছাইতে লাগিল।

তারা দীর্ঘ চরণক্ষেপে শম্ভুজীর পার্শ্বে আসিয়া তাহার হস্ত লৌহমুষ্টিতে

ধারণ করিয়া কহিল, মূর্খ, পলাও কোথায়? আইস, বিবাহ করিবে। এই বলিয়া তাহাকে পর্ব্বতকন্দরের মুখের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

শম্ভূজী ভীত হইয়া কহিল, সে কি? আমায় কেন টানাটানি করিতেছ?

"বিবাহের জন্য। যেখানে গোকুলজী গিয়াছে সেইখানে আমাদের বিবাহ হইবে।"

"বিদ্রূপ মন্দ নয়। আমার সঙ্গে কি এই বিবাহের পণ করিয়াছিলে?"

"নরক সাক্ষী করিয়াছিলাম। চল, আমরা নরকে যাই। আমরা অক্ষয় নরক ভোগ করিব।

"আমার এমন বিবাহে কাজ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহি না।

"শুন, শম্ভূজী। তুমি যখন আমাকে প্রথমে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে, তখন আমার হাতে কাঁটা বিঁধিয়া রক্ত পড়িয়াছিল। তখন আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি। শোণিত স্রোতেই আমাদের বিবাহ হইবে। সে সময় আসিয়াছে।" সর্পিণীর গরল নিশ্বাসের ন্যায় এ কথা শম্ভূজীর কর্ণে লাগিল।

গহ্বরমুখে এবং তারা ও শম্ভূজীর মধ্যে তিন হাত মাত্র ব্যবধান রহিল।

শম্ভূজী প্রাণের দায়ে টানাটানি আরম্ভ করিল। গৃধিনীর চঞ্চুমধ্যে ভুজঙ্গ যেমন ছট্‌ফট্‌ করে, সেইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তারা এক অঙ্গুলি পশ্চাতে সরিল না, অল্পে অল্পে শম্ভূজীকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শম্ভূজী প্রাণভয়ে কাতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

আর একপদ অগ্রসর হইলেই গহ্বরে পতিত হয়, এমন সময় গহ্বরের মধ্য হইতে অতি ক্ষীণ শব্দ হইল, "রক্ষা কর!"

প্রতিধ্বনি? না আশার ছলনা?

তারা মুখ নত করিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, গোকুলজী, তুমি কি জীবিত আছ?

তারা কাণ পাতিয়া রহিল। অনেক ক্ষণ কিছু শোনা গেল না, অবশেষে পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে শব্দ হইল, "আছি। রক্ষা কর।"

তারা পূর্ব্ববৎ কহিল, তুমি যেমন আছ, তেমনি আর কিছুক্ষণ থাক। তোমাকে রক্ষা করিব।

আর কোন উত্তর আসিল না।

আগ্রহাতিশয়ে তারা শম্ভুজীকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

তারা ফিরিয়া, শম্ভুজীর জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া, গ্রামমুখে ধাবিত হইল। কোন বাধা না মানিয়া, অনুল্লঙ্ঘনীয় স্থান সকল অতিক্রান্ত করিয়া, লতাপাতা ছিন্ন করিয়া, চরণে বিদলিত করিয়া বায়ুবেগে ছুটিল। তীক্ষ্ণ উপলখণ্ড চরণে বিদ্ধ হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক ফুটিতে লাগিল, তাহাতে সে ভ্রুক্ষেপ করিল না। একেবারে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, মহাদেব, ওঠ, ওঠ!

মহাদেব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?

"ওঠ, ওঠ, ভারি বিপদ। একজন লোকের প্রাণ যায়। তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

মহাদেব অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া চকমকি পাথর বাহির করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিল। তাহার পর গন্ধকের কাঠি জ্বালিয়া প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপালোকে তারার মুখ দেখিতে পাইয়া কহিল, কি, ব্যাপারখানা কি? হয়েচে কি?

"এখন বলিবার সময় নাই। একজন লোকের প্রাণ যায়, এখন বিলম্ব

করিলে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না। সঙ্গে মোটা মোটা দড়ি কাছি যত পার লও। আরও জন কতক লোক ডাকিয়া আমার সঙ্গে এস। দেরি কোরো না।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

মহাদেব প্রদীপ হাতে লইয়া দড়াদড়ী সংগ্রহ করিল। তারা দেখিয়া কহিল, ইহাতে কুলাইবে না।

"ঘরে ত আর নাই। যারা ক্ষেতে কাজ করে তাহাদের কাছে মোটা মোটা বড় বড় কাছি আছে।"

"চল, তাহাদের বাড়ী যাই।"

বাড়ীতে যে দুই একজন লোক ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া, তারা ত্বরান্বিত হইয়া, কৃষকদিগের গৃহে গেল। মহাদেব বেগে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিছাইয়া পড়িল। তারা চীৎকার করিয়া কৃষক পরিবারের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, রজ্জু ও সাত আটজন লোক লইয়া, পর্ব্বত-গহ্বরাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

কন্দরে পঁহুছিতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল, নক্ষত্র একে একে মিলাইয়া গেল, আকাশের নীলিমা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শুক্রতারার নিম্নে দুটি একটী কিরণাঙ্গুলিশীর্ষ দেখা দিল।

যে কন্দরে গোকুলজী পতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও বৃক্ষলতা, কোথাও কোথাও পা রাখিবার মত দুই একটা শিলাখণ্ড আছে। তাহাতে পতনশীল জীবের কিছুক্ষণ কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা। গহ্বর অত্যন্ত গভীর, অতলস্পর্শ। ভিতরে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, উপরে পতনশব্দ শোনা যায় না।

কন্দরাভ্যন্তরে কুজ্ঝটিকায় সমুদয় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পঞ্চহস্ত নীচে আর কিছু দেখা যায় না। কুজ্ঝটিকা নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উপরে ঘনাইয়া উঠিতেছে।

তারা মুখ বাড়াইয়া নীচে চাহিয়া দেখিল।

শুভ্রবর্ণ কুজ্ঝটিকা পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে, আর কিছু দেখা যায় না।

পূর্ব্বাকাশে শুক্রতারা মলিন হইতেছিল।

তারা ডাকিল, গোকুলজী, কোথায় আছ?

পার্শ্বস্থ লোকেরা গোকুলজীর নাম শুনিয়া শিহরিয়া তারার নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

তারা আবার ডাকিল, অতি উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল।

কোন উত্তর নাই। হয়ত কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া ক্ষীণ স্বর আসিতে পারিল না। হয়ত গোকুলজী আর জীবিত নাই।

তারা ফিরিয়া কহিল, দড়ী মজবুত করিয়া বাঁধ। কে নীচে যাইবে?

সকলে নিরুত্তর রহিল।

তারা মনে মনে হাসিল। তাহার সেই ফুলতোলা মনে হইল। প্রকাশ্যে কহিল, শীঘ্র দড়ি বাঁধ। কোন চিন্তা নাই, আমিই নীচে যাইব।

যোজনা করিয়া রজ্জু বিলক্ষণ দীর্ঘ হইয়াছিল। রজ্জু লইয়া তারা আপনার কটিদেশে দৃঢ়রূপে বাঁধিল। তাহার পর বলিল, আর একগাছা রজ্জু প্রস্তুত কর। একগাছায় দুইজনের ভর সহিবে না। জীবিত হউক, মৃত হউক, আমি গোকুলজীকে তুলিয়া আনিব। না পারি, আমি আর উঠিব না। তোমরা দড়ি সামলাও। ভাল করিয়া ধর, আমি ঝাঁপ দিব।

সকলে মিলিয়া রজ্জুর অপর প্রান্তে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর জড়াইয়া প্রাণপণে টানিয়া রহিল। তারা আর একবার নীচে চাহিয়া লাফাইয়া পড়িল।

শিথিল রজ্জুতে অতি বেগে আকর্ষণ পড়িল। তারা পর্ব্বতকন্দরগর্ভে ঝুলিতেছে!

যদি রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়!

যাহারা উপরে দড়ী ধরিয়াছিল, তাহারা প্রস্তরখণ্ডে ভাল করিয়া দড়ী বাঁধিয়া, দুই তিন জনের হাতে সেই দড়ি দিয়া, গহ্বরের ধারে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নীচে চাহিয়া দেখিল।

কুজ্ঝটিকা চক্রীভূত, কুণ্ডলীভূত হইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া, জড়াইয়া জড়াইয়া, পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে!

নীচে হইতে দড়ী চারিদিকে স্থানান্তরিত হইতে লাগিল।

তারা গোকুলজীর অন্বেষণ করিতেছে।

রজ্জু শিথিল হইল।

কোন উপায়ে, হয়ত বৃক্ষমূল ধরিয়া তারা উপরে উঠিতেছে। গোকুলজীকে খুঁজিতেছে।

সূর্য্য উঠিল।

গ্রাম হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছে। কৃষকপত্নীরা সকলকে সংবাদ দিয়াছিল।

গহ্বরপার্শ্বে বিস্তর লোক দাঁড়াইল। পালা করিয়া তিন চার জনে দড়ি ধরিয়া রহিল।

রজ্জু বড় শিথিল হইয়াছে।

বোধ হয় তারা অনেক উপরে উঠিয়াছে।

সহসা অতি তীব্র চীৎকারধ্বনি উঠিল।

বহু দূরে নয়, অনেক নীচে নয়। যেন অল্প দূরে, বিংশ হস্ত নীচে সেই চীৎকার শ্রুত হইল।

তারা গোকুলজীকে দেখিতে পাইয়াছে? ভয় পাইয়াছে? তাহাকে সর্প দংশন করিয়াছে? মূর্চ্ছিত হইয়াছে?

সকলে ব্যগ্র চিত্তে দড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। দড়ী কোন সঙ্কেত করিল না। সুস্থির।

রৌদ্র বাড়িতে লাগিল। কুজ্ঝটিকাজাল তরল হইতে আরম্ভ হইল।

দড়ি সজোরে নড়িয়া উঠিল। মহাদেব, সে সঙ্কেত বুঝিয়া আর এক গাছা রজ্জু ফেলিয়া দিল।

রজ্জুস্পন্দন রহিত হইল।

অনেক ক্ষণ পরে আবার দুই রজ্জু একত্রে স্পন্দিত হইল।

মহাদেব কহিল, এইবারে সকলে মিলিয়া দড়ি ধর। দুই দড়ি ভাল করিয়া পাথরে বাঁধ। তাহার পর আস্তে আস্তে তোল। হুড়াহুড়ি করিও না। জোরে টানিও না। দুই দড়ী এক সঙ্গে টান। ধীরে, ধীরে।

কুজ্ঝটিকা ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

তখন সকলে দেখিল, তারা নিম্নমুখী হইয়া সাবধানে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গোকুলজীর কটি রজ্জু ধারণ করিয়াছে। বামহস্তে বৃক্ষ, প্রস্তর ধরিয়া গোকুলজীর ও আপনার শরীর রক্ষা করিতেছে, যাহাতে অঙ্গে আঘাত না লাগে।

গোকুলজীর মস্তক স্কন্ধে ঝুলিতেছে, দেখিতে মৃত প্রায়। নীচে অত্যন্ত অন্ধকার।

উপর হইতে ধীরে ধীরে টানিতে লাগিল।

যদি রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়!

যাহারা দড়ী টানিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে যদি রজ্জু স্খলিত হয়!

যদি কটিবন্ধন খুলিয়া যায়!

সে সব কিছু হইল না। গহ্বরের মুখের সমীপবর্ত্তী হইলে সকলে মিলিয়া গোকুলজী ও তারাকে টানিয়া তুলিল।

দুইজনকে ধরিয়া বসাইল। দুইজনে পড়িয়া গেল। গোকুলজী নিমীলিতচক্ষু, শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করা যায় না; সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত, পৃষ্ঠ দিয়া এখনও অল্প অল্প রক্ত বহিতেছে।

তারা একদৃষ্টে গোকুলজীর দিকে চাহিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াও অন্য দিকে চাহিল না। গোকুলজীর পার্শ্বে পতিত হইয়া তাহার বক্ষের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিল। কিছু পরে, চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল।

গোকুলজীর হৃদয়ের উপর তারার দক্ষিণ হস্ত স্থাপিতই রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাদেব জন কতক লোকের সাহায্যে দুইজনকে তদবস্থায় গৃহে লইয়া গেল। তারা মূর্চ্ছিতা, গোকুলজী জীবন্মৃত। গোকুলজীকে নিজের ঘরে শয়ন করাইল। তারাকে তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিল।

লোকে সন্দেহ করিয়াছিল তারাই কোন উপায়ে গোকুলজীকে পর্ব্বত-গহ্বরস্বরূপ সাক্ষাৎ মৃত্যুগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে। তারার অলৌকিক

সাহস এবং পরের প্রাণরক্ষার জন্য এরূপ আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া তাহাদের সে সন্দেহ নিরাকৃত হইল। সে দৃশ্য তাহারা কখন ভুলিল না।

গোকুলজীর পৃষ্ঠক্ষত দিয়া রক্ত বহিয়া তাহাকে আরও বলশূন্য এবং জীবনশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল, মহাদেব ক্ষতমুখ বন্ধ করিয়া শোণিতস্রাব রহিত করিল। অল্পে অল্পে গোকুলজীর চৈতন্যোদয় হইল।

তারার মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল ভঙ্গ হইল না। মানুষের শরীর, মন তার বাঁধা যন্ত্রের মত। তারার শরীরে, মনে এত আকর্ষণ পড়িয়াছিল, যে অন্য কেহ হইলে জীবন রক্ষা ভার হইত। তারা অনেকক্ষণ মূর্চ্ছিত রহিল।

মূর্চ্ছাপগমে তারা চারিদিকে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, গোকুলজী!

নিকটে একজন দাসী শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, কহিল, গোকুলজী বাঁচিয়া আছে। একটু ভাল আছে।

তারা আবার মূর্চ্ছিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার উত্তমরূপ চৈতন্য হইল, তখন সে এত দুর্ব্বল যে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। সেই অবস্থায় মহাদেবকে ডাকাইল। মহাদেব আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গোকুলজী কেমন আছে?

"অনেক ভাল।"

"বাঁচিবে ত?"

"বাঁচিবে বই কি। সে জন্য তুই কোন চিন্তা করিস্ না এখন উঠেহেঁটে বেড়া।"

তারা কহিল, বড় কাহিল বোধ হইতেছে। উঠিতে পারিতেছি না।

"শরীরের আর অপরাধ কি? ধন্য সাহস তোর! আজ তুই দেবতার কাজ করিয়াছিস্। তা, খেলে দেলেই কাহিল সেরে যাবে এখন।"

তারা আর একবার কহিল, না সারিলে যেন গোকুলজী না যায়।

"পাগল না কি! এখন কি গোকুলজীর নড়িবার শক্তি আছে? কেউ যদি তাকে নিতে আসে, তখন আমি যেতে দিলে ত।

যেই তারা একটু বল পাইল, অমনি উঠিয়া গিয়া গোকুলজীর শয্যার পার্শ্বে বসিল। গোকুলজীর মুখ ম্লান, চক্ষু মুদ্রিত, অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থায় শয়ান

রহিয়াছে। সে তারাকে দেখিতে পাইল না, দেখিলেও চিনিতে পারিত না। সে এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ চেতনা প্রাপ্ত হয় নাই।

দিন দুই পরে তারা গোকুলজীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ গৌরী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তারার রাগ হইল, কহিল, এখানে কোন ভরসায় আসিয়াছিস্? তোর বুকে যে বড় বল দেখিতে পাই।

গৌরী রাগিয়া কহিল, আমি তোমার বাড়ী আসি নি, তোমার কাছেও আসিনি। যাহার কাছে আসিয়াছি, সে ঐ শুইয়া রহিয়াছে।

তারা দেখিল গোকুলজী নিদ্রিত। সে নতচক্ষে কিয়ৎকাল ভাবিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, আমারই ভুল। পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গৌরী আসিয়া গোকুলজীর পাশে বসিল।

অল্পকাল পরেই তারা ফিরিয়া আসিয়া গৌরীকে বলিল, এক বার পাশের ঘরে এস। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

তারার কথায় কিছু রাগ নাই, তবু গৌরীর তত সাহস হইল না। কহিল, কি বলিবে, এইখানেই বল, আমি আর কোথাও যাইব না।

তারা ঘরে আসিয়া গোকুলজীর চরণের নিকট দাঁড়াইয়া, গৌরীকে নিকটে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, তুমি আমাকে বড় মন্দ মনে কর, না? যথার্থ কথা। আমার মত পাপীয়সী আর ইহ জগতে নাই। সেই পাপের সাধ্যমত প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার এই বাড়ী তোমাদের দিয়া পাহাড়ে চলিলাম। এই ঘর দোর তোমাদের রহিল।

গৌরী আকাশ হইতে পড়িল। ভাবিল, তারা পাগল হইয়াছে। কহিল, সে কি কথা! তোমার বাড়ী আমি নেব সে আবার কেমন কথা! তোমার বাড়ী তোমার ঘর, তুমি জন্ম জন্ম ভোগ কর, আমি কেন নিতে গেলাম? এমন অনাছিষ্টি কথাও মানুষে বলে!

তারা আবার কহিল, আমার কথা শোন। কোন উত্তর করিও না। গোকুলজী তোমাকে চায়, তুমি গোকুলজীকে চাও, আমি মাঝখানে কেন? আমার মন আমার বশে নয়। আমি এখানে থাকিলে তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দের

অনেক ব্যাঘাত জন্মিবে। আমি এ পাপ মন বশ করিব। সংসারের আমার আর কোন বন্ধন নাই। আমি পর্ব্বতে চলিলাম। সেখানে কোন জ্বালা নাই। যাবার সময় তোমাদের এই বাড়ী আর আমার বিষয় সম্পত্তি দিয়া চলিলাম। দিয়াই আমার সুখ, আমার এ টুকু সুখে বিঘ্ন ঘটাইও না। গোকুলজীকে আমি বেশ জানি। তাহার কাছে মহাদেবের কোন কষ্ট হইবে না। মহাদেবের নিজের টাকাও আছে। তুমি ভাল করিয়া গোকুলজীর শুশ্রূষা করিও। বিবাহের সময় একবার আমাকে মনে পড়িবে ত? আমি চলিলাম। এই ধর।

এই বলিয়া তারা গৌরীর হাতে এক গোছা চাবি দিল।

গৌরীর মুখ কাঁদ কাঁদ হইল। সে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কহিল, তোমার বড় ভুল হইয়াছে, তারা। তুমি কি মনে করিতে কি মনে করিয়াছ। আমাদের বিবাহ কখন হবার কথা নয়। সব কথা যদি তোমাকে বলিবার হইত—

তারা আর দাঁড়াইল না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এতদিনে সব ফুরাইল, আশা ভরসা সব ঘুচিল, সব সাধ মিটিল। প্রণয় গিয়াছে আর গৃহসংসারে কাজ কি? যে পাখীর জন্য খাঁচা কিনিয়াছিলাম, সেই পাখীই উড়িয়া গিয়াছে। এখন আর পিঞ্জর লইয়া কি হইবে? রূপ বল, যৌবন বল, অর্থ বল, এ সব লইয়াও মানুষ বাস করে বটে। শুধু কি প্রণয় লইয়াই লোকে ঘর করে? না, তা নয়। অল্প বয়সে অনাথিনী হইয়াও ত বিধবা বনে যায় না। সংসারে তার কোন সুখই নাই, তবু ত সে সংসারেই থাকে। তবে তারার প্রকৃতি তেমন ছিল না। তাহার হৃদয়ে

যে সময় যে আগুন জ্বলে তাহাতেই আর সব পুড়িয়া যায়। যখন প্রণয়ের রাজত্ব তখন আর সব দাহ হইতেছিল। প্রেম গেল ত আর কিছু পুড়িবার রহিল না। এখন কি পোড়াইবে? নিজে পুড়িবে?

পাপের গরল চিন্তাকে তারা আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল। এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিল, ইহার কমে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। পাহাড়ে থাকা তাহার অভ্যাস, সেইখানে গিয়া একা রহিল।

ঝঞ্ঝাবাত, প্রবল ঝটিকা দেখিলে ভয় হয়। মেঘগর্জ্জনে হৃৎকম্প হয়। বিদ্যুৎ চমকিলে প্রাণ চমকিয়া ওঠে, চক্ষু ঝলসিত হয়। সমুদ্রে তুফান অতি ঘোর দর্শন, উত্তুঙ্গতরঙ্গমালা দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। ঝটিকা গর্জ্জিতেছে, রুদ্ধ দ্বার বেগে আহত করিতেছে, গাছপালা ভাঙ্গিয়া, ফুল ছিঁড়িয়া ভীষণ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কখন সিংহগর্জ্জনে ধরাতল কম্পিত করিতেছে। সে হুহুঙ্কার শুনিলে প্রাণী ভীত হয়।

আর এক প্রকার ঝটিকা আছে। সে ঝটিকার দৌরাত্ম্য কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতে পায় না। সে ঝড় কোন কথা কয় না, কোন সাড়া দেয় না, কোন শব্দ করে না। সে ঝড় অন্ধকার করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আইসে। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! সেই ঘোরান্ধকারে সে একা ভ্রমণ করে। সে মূক, অন্ধ। বাহু প্রসারিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই নিঃশব্দে চূর্ণিত বিচূর্ণিত করে। আবার বক্র পদক্ষেপে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অন্ধকারে মেঘ গর্জ্জন করে না, বিদ্যুৎপ্রভা স্ফুরিত হয় না। কেবল অন্ধকার বাড়িতে থাকে, আর সেই অন্ধকারে সেই ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা যাহা পায় তাহাই ধরিয়া চাপিতে থাকে। সে ঝটিকার অবসানে চাহিয়া দেখ, আর কিছু দেখিতে পাইবে না। যেখানে সুন্দর হর্ম্ম্যশোভিত নগরী দেখিতেছিলে সেখানে আর তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইবে না। যেখানে সহস্র জীবের আনন্দ কোলাহল শুনিতেছিলে সেখানে জীবনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইবে না। যেখানে জনপদ সেখানে মরু, যেখানে মনোহর অরণ্যানী সেখানে বিশাল প্রান্তর, যেখানে কলরব সেখানে স্তব্ধতা, যেখানে স্রোতস্বতী সেখানে মরীচিকা দৃষ্ট হইবে।

এ ঝটিকা বড় ভয়ানক।

তারার হৃদয়ে এই ঝড় বহিয়াছিল।

দুঃখের মধ্যে এই টুকুই সুখ। যাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়, তাহাকে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। সে কোন যন্ত্রণা অনুভব করে না। ঘোর আপৎকালে লোকে স্তম্ভিত হয়। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে লোকে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়। তাহাতেই অনেক রক্ষা। তারা নিজের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছিল। কেন রাগ করিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গিয়া কিছু ঠিক পায় না। মন শিথিল, শরীর শিথিল, বুদ্ধি স্খলিত হইতে লাগিল। তাহার প্রাণের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধূ-ধূ করিতে লাগিল। পর্ব্বতে ফলাহারমাত্র প্রাণধারণের উপায়। সব দিন ফল আহরণেও যাইত না। শরীর দিন দিন অবসন্ন, হীনবল হইয়া পড়িল। তারা ভাবিল, মৃত্যু নিকট।

পাহাড়ে প্রভাতকালে পাখী ডাকিত, নির্ঝর কলকল রব করিয়া, চঞ্চল বেগে নীচে গড়াইয়া যাইত, প্রভাতপবনের স্পর্শে রজনীর মোহ ভঙ্গ হইত, মেঘ, সূর্য্যের কিরণ চুরী করিয়া, পর্ব্বতশিখরের কণ্ঠে বসিয়া, তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। পর্ব্বতগুহার মুখে লতাপাতায় ফুল ফুটিয়া প্রভাত সূর্য্যালোকে হাসিত। মধ্যাহ্নকালে পাতার আড়ালে বসিয়া বনবিহঙ্গিনী করুণ স্বরে গান করিত।

সূর্য্য আলো করিয়া উদিত হয়, রক্তমুখে অস্ত যায়। পূর্ণিমার চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অন্ধকারে লুকাইল, তাহাতে তারাগুলির মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আবার পূর্ণিমা আসিল। পবিত্র কিরণে পর্ব্বত ধৌত করিয়া চন্দ্র উঠিল। তারা কুটীরের বাহিরে বসিয়া একখণ্ড প্রস্তরে মস্তক রক্ষা করিয়া শূন্যমনে চাঁদের পানে চাহিয়া আছে। সে কি ভাবিতেছে? সে কি আপনার অদৃষ্টের কথা মনে করিতেছে? জীবনে কোথাও সুখ নাই, তাহাই ভাবিতেছে? না, তাহার সে ক্ষমতা নাই। দুঃখের ভাবনা ভাবা আরও দুঃখ। সেটী তারার ঘটে নাই। চাঁদ উঠিল, তাহার হৃদয় আলোকিত হইল না। সে চাহিয়াই রহিল। চাঁদ মাথার উপরে উঠিতেছে, আবার পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল, মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, কখন আকাশপ্রান্তে তারা

খসিতেছে, কখন শুষ্কপত্রের পতনশব্দ, কখন শৃগালরব, কখন পবনের মরমর সরসর নিশ্বাস, কখন ঝরণাপাতশব্দ, কখন নিশীথপ্রতিধ্বনি। তারা বসিয়া বসিয়া, শেষে শয়ন করিয়া চাহিয়াই রহিল। কিছু দেখিল না কিছু শুনিল না। শূন্যমনে, শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল। চন্দ্র পশ্চিমে গেল, বায়ু শীতল হইল, তারার একবার একটু শীত বোধ হইল, আবার সে চাহিয়াই রহিল। পরিশেষে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল।

সূর্য্যকিরণ স্পর্শে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শিশিরসিক্ত কেশে, মলিন মুখখানি তুলিয়া, তারা ভাবিল উঠিয়া কুটীর মধ্যে যাই। প্রভাত সূর্য্যের আলোক ভাল লাগিল বলিয়া আর উঠিল না। ম্লানমুখে, শিশিরমুক্তাশোভিত কেশে, প্রভাতকালে কোন ম্লান কমলিনী তুল্য বসিয়া রহিল।

সহসা তারা দেখিল সেই বিজন, নির্ম্মনুষ্য স্থানে একজন লোক আসিতেছে। দূর হইতে মুখ চেনা যায় না, তবু তারার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। দীর্ঘচরণবিক্ষেপে তারার কুটীরাভিমুখে কে চলিয়া আসিতেছে। আর কি চিনিতে বাকী থাকে?

যষ্টি হস্তে, যষ্টির উপর ভর করিয়া গোকুলজী পর্ব্বতারোহণ করিতেছে!

বাণবিদ্ধ বিহঙ্গিনী তুল্য তারা কাতর চীৎকার করিয়া কহিল, এখানে, এখানেও আবার আসে কেন? যাহা ভুলিতে আসিয়াছি, আবার তাহাই মনে পড়িবে।

গোকুলজী দ্রুত চলিয়া আসিতেছে, দেখিয়া তারা তাহাকে হস্ত দ্বারা ফিরিতে ইঙ্গিত করিল। গোকুলজী ফিরিল না। তখন, তারা যে প্রস্তরখণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়া নিশা যাপন করিয়াছিল, তাহাই দুই হস্তে জড়াইয়া প্রস্তরে মুখ লুকাইল।

গোকুলজী আসিয়া কহিল, এ কি এ, তারা?

তারা কহিল, যাও, যাও, তুমি এখানে কেন? এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও। আমি আর কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি না। তুমি এখান হইতে যাও।

শীর্ণ শুষ্ক লতাজাল যেমন সহজে কোন বৃক্ষ হইতে উন্মোচিত করা যায়, গোকুলজী সেইরূপে তারার বাহুবন্ধন খুলিয়া তাহাকে আপনার বক্ষে

ধারণ করিল। তারা মুমূর্ষুর মত কহিল, কি কর! আমাকে ছাড়িয়া দাও! তুমি যাও, যাও, এখানে কেন আসিয়াছ?

গোকুলজী কহিল, "শোন, একটা কথা শোন।" তাহার পর সে তারার রুক্ষ কেশে শিশিরবিন্দু দেখিয়া কহিয়া উঠিল, তুমি কি সমস্ত রাত্রি হিমে বসিয়াছিলে? চল, আমার সঙ্গে বাড়ী চল।

তারা গোকুলজীর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া একটু দূরে গিয়া বসিল। কহিল, গোকুলজী তুমি আমার নিকটে আসিও না। যাহা বলিবার হয় ঐখান হইতেই বল। আমি আর ঘরে ফিরিব না। সে কথা আমায় আর বলিও না।

গোকুলজী। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া আসিলাম, আর তুমি যাইবে না?

তারা। না। আমি না যাই, তোমার তাবে ক্ষতি কি?

গোকুলজী কহিল, আমার তাতে কি? তুমি না ফিরিলে আমার বাঁচিয়া কি সুখ? তোমাকে না পাইলে জীবনে সুখ কোথায়?

"ও কি কথা! তুমি গৌরীর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কর। আমার কাছে ও সকল কথা কি তোমার বলা উচিত।"

"তারা, আজ তোমাকে অনেক কথা বলিতে হইবে, নহিলে তুমি বুঝিবে না। আর কাহাকেও সে সব কথা বলিবার নয়, কিন্তু তোমাকে বলিতেই হইবে। প্রণয় কি তাহা আমি আগে জানিতাম না। তোমাকে দেখিয়া অবধি, আমার প্রাণে নূতন আলোক আসিয়াছে। আমার প্রাণ তুমি একবার রক্ষা করিয়াছ। তোমাকে না পাইলে সে প্রাণে আমার কাজ কি?

তারা মাথা নাড়িল।

গোকুলজী আবার বলিতে লাগিল, তবে তোমায় খুলিয়া না বলিলে তুমি বুঝিবে না। গৌরী আমার ভগিনী।

তারা চমকিয়া উঠিল। আগে অনেক কথা বুঝিতে পারিত না, এখন বুঝিল। আবার ভাবিল ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ লুকাইবে কেন?

"শুন তারা। কলঙ্কের কথা বলিয়াই আমি এ সম্বন্ধ গোপন করিয়াছি।

গৌরী আমার সহোদরা ভগিনী নয়। আমার পিতা কিছুদিন আর এক স্থানে গিয়া একেলা বাস করিতেন। সেই খানে গৌরীর জন্ম হয়। গৌরীর মাতার সহিত আমার পিতার বিবাহ হয় নাই। পিতা এ কথা অনেক দিন পরে আমার জননীকে বলিয়াছিলেন। মেয়েটী বড় কষ্ট পাইতেছে শুনিয়া মাতা মৃত্যুকালে আমাকে সব কথা বলিয়া যান। গৌরীর মাতা জীবিতা নাই। তাই আমি তাহাকে একটা আশ্রয় দিয়াছি। এখন বুঝিলে ?"

তারা বুঝিল। কিন্তু ভাবিল, গোকুলজী আমায় যে ভালবাসে সে কেবল কৃতজ্ঞতার ফল। আমি ইহার একটু উপকার করিয়াছিলাম তাই সে আমায় বিবাহ করিতে চাহিতেছে। প্রকাশ্যে কহিল, গৌরী যেন তোমার ভগিনী হইল। কিন্তু আমার সঙ্গে আর এ জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি।

" আমার সহিত ও কি তোমার কোন সম্বন্ধ নাই ? নহিলে আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে কেন ? সে ভয়ঙ্কর দিনে তুমি না থাকিলে কে আমায় রক্ষা করিত ? যে পাপিষ্ঠ আমার জীবন বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কে তাহার চেষ্টা বিফল করিল ? তারা, আর তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। তুমি আমার সঙ্গে না যাও, আমি তোমায় কখন পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি এখনও দুর্ব্বল, সকলে আমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল। আমি কাহারও কথা শুনি নাই। তুমি ত আমার মন জান না। যে দিন তোমাকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম সেই দিন হইতেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে তোমার অনেক কুৎসা করিত, সকলে তোমায় বড় মন্দ বলিত বলিয়া আমি তোমার নিকটে আসিতাম না। দূরে থাকিতাম। সেই জন্য যখন এই স্থলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমাকে মন্দ কথা বলিয়াছিলাম, তোমার কুটীরে অবস্থান করি নাই। তখন আমার হৃদয়ের ভিতর কি হইতেছিল, জান ? আমার ভয় ছিল পাছে তোমার কাছে অধিকক্ষণ থাকিলে তোমাকে না ছাড়িতে পারি, পাছে তুমি আমায় তাচ্ছিল্য কর, উপহাস কর। লোক মুখে তোমার আচরণ শুনিয়া কতবার তোমাকে একেবারে ভুলিবার চেষ্টা করিতাম, কখন পারিতাম না। শেষে যখন শুনিলাম তুমি

বিনা দোষে গৌরীর অপমান করিয়াছ, তখন ক্রোধে অন্ধ হইলাম। গৌরী নেহাত ভালমানুষ, কখনও কাহারও সহিত কলহ করে না, সেইজন্য আরও রাগ হইল। ক্রোধোপশম না হইতেই তোমাকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় অপমানিত করিলাম। তাহার পর মনের মধ্যে কি হইতেছিল, তা কি তুমি জান, তারা? মনে মনে আপনাকে কত ধিক্কার দিয়াছিলাম, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তোমার মলিন মুখখানি স্মরণ করিয়া মরিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তা কি তুমি জান? পরে অন্ধকার হইলে আমি তোমার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তোমার দেখা পাইলে তোমার পা ধরিয়া তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিব, তাহা হইলে আর তোমার রাগ থাকিবে না। বুকের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল, তারা! তোমার দেখা না পাইয়া অস্থির হইয়া কোথায় চলিয়া গেলাম। শেষে দেখি পাহাড়ে গিয়া পড়িয়াছি। ভাবিলাম সেইখানে বেড়াইলে মনের জ্বালা একটু জুড়াইবে। এমন সময় বালকের রোদনশব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে গেলাম। সন্দেহ হইল কোন বালক পথহারা হইয়া একা কাঁদিতেছে। তাহার পর কি হইল, আমি জানি না। তুমি জান। বোধ হয় ডাকাতে আর কাহারও সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে ভ্রমবশতঃ আমাকেই মারিয়াছিল। তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তুমি আমায় রক্ষা করিলে। এখন আমি তোমাকে ছাড়িয়া একেলা ফিরিয়া যাইব?"

গোকুলজী তারার চরণের নিকট শয়ন করিয়া করতলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া এই সব কথা বলিল।

তারার চক্ষের আলোক অন্ধকারে মিশাইল। ধীরে কহিল, গোকুলজী, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার আমার মধ্যে নরক মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমি ঘোর পাপিষ্ঠা। শোন তুমি, শুনিয়া আমার নিকট হইতে পলায়ন কর। তুমি বলিতেছ, তস্করে তোমার প্রাণ হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে। শোন গোকুলজী, সে তস্কর আমি। স্বহস্তে আমি তোমার জীবনবিনাশে উদ্যত হই নাই, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পাতকে আর একজনকে নিয়োজিত করিয়াছিলাম। সে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম। গোকুলজী

শ্রবণপথ রোধ কর, আমার দিকে চাহিও না। এইবার এ অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর।

গোকুলজী ধীরে ধীরে উঠিয়া, মৃদু মৃদু হাসিল। তাহার পর তারার দিকে চাহিয়া অতি মুক্ত কণ্ঠে কহিল, শোন তারা, সূর্য্য সাক্ষী, এই প্রকাণ্ড পর্ব্বত সাক্ষী! তুমি যেমন আছ, তেমনি আমি তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তুমি যেমন দোষাশ্রিত আছ, তেমনি থাক। আমি তোমা হইতে ভাল চাহি না। একবার ছাড়িয়া তুমি যদি শতবার আমায় হত্যা করিতে চাহিতে, তাহা হইলেও আমি তোমাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিব। তুমি আমার প্রাণদাত্রী। তোমা ব্যতীত আমার জীবনে সুখ নাই। তোমাব ঘরে তুমি যাইবে চল। এস, তুমি আমার হৃদয়কে আলোকিত করিবে, এস।

সূর্য্যেব মুখ বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গোকুলজী তারাকে তুলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার মুখ চুম্বন করিল। তারা বাতকম্পিত পত্রবৎ থর থর কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ গোকুলজীর বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল। গোকুলজী, সেই শীর্ণ, সুন্দর মুখ তুলিয়া আবার চুম্বিত করিয়া কহিল, তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছ। তোমার সে বল গেল কোথায়?

তারা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, তুমিই বা কি হইয়াছ?

গোকুলজী বলিল, আমি তবু তোমাব চেয়ে ঢের সবল আছি। আর কিছু দিনে সারিয়া উঠিব। তখন তোমারও এ মূর্ত্তি থাকিবে না।

তারা একটু খানি হাসিল।

গোকুলজী কহিল, চল, তবে বাড়ী যাই।

"চল।"

দুইজনে পরস্পরের মুখ দেখিতে দেখিতে প্রভাত তপনালোকে পর্ব্বত হইতে নামিয়া চলিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ মহাদেব তারাকে দেখিতে না পাইয়া বড় ব্যাকুল হইয়া গৌরীকে জিজ্ঞাসা করাতে গৌরী তাহাকে সব বলিল, কেবল গোকুলজীর সহিত আপন সম্বন্ধ গোপন রাখিল। মহাদেব পুনরায় তারার সন্ধানে পর্ব্বতে যাইবে স্থির করিয়া গোকুলজীর নিকট বিদায় লইতে গেল। গোকুলজী তখন বড় দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্কের কোন জড়তা নাই। মহাদেবের মুখে তারার পর্ব্বতপ্রস্থান সংবাদ অবগত হইয়া গোকুলজী গৌরীকে ডাকিয়া তাহার মুখে সব বৃত্তান্ত জানিল। তখন সে ক্ষীণ হস্ত দ্বারা মহাদেবের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে বলিল, "মহাদেব, তুমি তারাকে আনিতে যাইও না। বোধ হয় তোমার সঙ্গে সে আসিবে না। আমার একটা কথা রাখ। আমি তারাকে আনিতে যাইব। এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ সবল হইয়া উঠিব। তারা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। কেন? আমি তাহার দারুণ অপমান করিয়াছিলাম বলিয়া। এখন এ প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? দেখ, মহাদেব, যে সময় আমি তারাকে অপমান করি তখন আমার হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি জাগিতেছিল। তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিবে না। যাহাকে ভাল বাসি, তাহাকে কেমন করিয়া এমন অপমান করিলাম? শুন মহাদেব। ক্রোধের বেগে প্রণয় ভাসিয়া গিয়াছিল। তুমি আমার এই কথা রাখ। তারাকে আমি আনিতে যাইব। যে জীবন তারা রক্ষা করিয়াছে, সে জীবন তারার। তারাকে না পাইলে এ জীবনে কাজ নাই। আমি গিয়া নিজে তারাকে জিজ্ঞাসা করিব, এমন অপমানের পর সে আবার আমার মুখ দেখিতে পারে কি না। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? সে অপমানের ত প্রতিশোধ হইয়াছে। আমি তারার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছি, সে আপনার জীবন উপেক্ষা করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। মহাদেব, আমি তারাকে আনিতে যাইব। তুমি যাইও না।

মহাদেব গোকুলজীর কাতরতা দেখিয়া তাহার কথায় সম্মত হইল। কিন্তু গোকুলজী সুস্থ সবল হইতে তিন সপ্তাহ লাগিল। তখনও সে তেমন সবল হয় নাই। গৌরী কোন মতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। মহাদেব ও কহিল, "গোকুলজী, আর দুইচারি দিন পরে যাইও। এখন গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" গোকুলজী একটু হাসিয়া কহিল, "আমি যাইতে না পাইলে কখন সবল হইব না। তারাকে আনিতে গেলে আমার শরীরে দ্বিগুণ বল বাড়িবে।"

গোকুলজী পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থিত হইলে মহাদেব ও গৌরী অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তাহার পথ চাহিয়া রহিল। পরদিবস দ্বিপ্রহর সময়ে গোকুলজী ও তারা ফিরিয়া আসিল।

তারার মুখ দেখিয়া গৌরী বুঝিল, তারা সব জানিয়াছে। সে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া তারার সম্মুখে দাড়াইয়া রহিল। তারা তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

এতদিনের পর মহাদেবের আশা পূর্ণ হইল। সে সেই রাত্রে তাড়াতাড়ি উদ্যোগ করিয়া গোকুলজীর সহিত তারার বিবাহ দিল।

বিবাহের কয়েক দিন পরে গৌরী তারাকে কহিল, "আমি ভীলপুরে যাইব।" তারা তাহাকে কোন মতে ছাড়িয়া দেয় না। গৌরী অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, বলিল, "যে আমাকে এতদিন আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাকে একবার বলিয়া আসি। নহিলে মনে করিবে, আমি তোমার কাছে সুখে থাকিয়া তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি।" তখন তারা তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাও, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আসিবে, বল।"

গৌরী শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, প্রতিশ্রুত হইয়া ভীলপুরে গেল।

সুন্দর আর সুন্দরী, বাঞ্ছিতের সহিত বাঞ্ছিত মিলিল। জীবনের অস্থির মানদণ্ড এতদিনে স্থির হইল। কাল সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছি, পশ্চাতে কোলাহল, সম্মুখে কোলাহল, কিরূপে পার হইব জানি না, কি করিব জানি না, চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এমন সময় কে আসিয়া আমার হাত ধরিল। বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণ আর অন্তঃপ্রকৃতির আকর্ষণ। এ উহাকে টানিতেছে। কেহ জানেনা কে কাহাকে টানিতেছে, সহসা দুইজনের মিলন

হইল। অমনি সব পূর্ণ হইল, শূন্য কলস অমৃতপূর্ণ হইল, অন্ধকার কক্ষ আলোকময় হইল, জীবনের বাসনাময় মহাশূন্য পূরিয়া গেল।

শম্ভুজী আর ফিরিল না, সেই অন্ধকারে, নিশাশেষে নিরুদ্দেশ হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের জীবনের সহিত স্রোতস্বিনীর সাদৃশ্য দর্শিত হইয়া থাকে। তটিনী যেমন নানা দেশ বহিয়া যায়, মানুষের জীবন তেমনি বহুবিধ অবস্থায় পতিত হয়। নদীর পথ যেমন বক্র, মনুষ্যের জীবনপথ তেমনি জটিল। পথে কোথাও মরু, কোথাও কুসুমিত কানন, কখনও পাষাণভেদ করিয়া অন্ধকারে বহিতেছে, কোথাও সূর্য্যকিরণে তরঙ্গ তুলিয়া হাসিতেছে। পরিণামে সেই বিশাল সাগরসঙ্গম, কাল সমুদ্রের অতল গর্ভ। সেইজন্য জীবনকে তটিনী বলে।

কখন অন্যরূপ প্রবাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোন নির্ঝর কতদূর অন্ধকারে বহিয়া যায়, সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না। অবশেষে প্রশান্ত নদীরূপে, সূর্য্যালোকে, শস্যশোভিত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। কিছুদূর এইরূপে বহিয়া অকস্মাৎ অতি বেগে নিরবলম্ব পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া শত সহস্র হস্ত নীচে পাতিত হয়। সে প্রশান্ত, আনন্দোদ্বেলিত মূর্ত্তি আর থাকে না, সে মধুর শান্তি ভয়ঙ্কর অশান্তিময় হইয়া উঠে।

তারার জীবনতটিনী এতদিনের পর শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। এইবার প্রপাত সম্মুখে।

গোকুলজীর সহিত বিবাহ হইলে তারার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

ভাবিল, এতদিনের পর বুঝি দুঃখের অবসান হইয়াছে। গৌরীকে আপনার গৃহে আনিয়া তারা তাহাকে সহোদরার মত যত্ন করিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক মাস গেল। কয়েক মাস পরে তারার সেই পূর্ণ সুখের মধ্যে একটা কিসের অপূর্ত্তা প্রবেশ করিল। নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাত্রে আকাশ-প্রান্তে কোথায় যেন একটা মেঘ উঠিল। তারার সুখ হরণ করিবার জন্য অন্ধকার হইতে যেন একটা দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত হইল। কোথায় কোন ছিদ্র পাইয়া নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিল। তারার হৃদয়ে অজানিত দুঃখের অস্পষ্ট ছায়া পড়িল।

একদিন রাত্রে তারা স্বামীর পার্শ্বে শয়িতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, পর্ব্বতশৃঙ্গে সেই ভীষণাকৃতি পাষাণপুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নক্ষত্রকিরণ দীর্ঘ জটায় প্রতিঘাত করিতেছে, শুভ্র, নির্নিমেষ চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কটি, চরণ বেষ্টিত করি... জলদমালা ফিরিতেছে। চরণপার্শ্বে ইন্দ্রধনু শোভিতেছে, ক্ষণে উঠিতেছে, ক্ষণে মিলাইতেছে। মহাপুরুষ ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান ছিল, ধীরে ধীরে তারার দিকে মুখ ফিরাইল। নক্ষত্রকিরণ তুষারচক্ষে প্রতিহত হইয়া তারার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তারাকে দেখিয়া মহাপুরুষ বিশাল ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিল। কাদম্বিনীকুল সন্ত্রস্ত হইয়া অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল। তৎপরে মহাকায় পুরুষ দূরমেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর স্বরে তারাকে কহিল, "যখন লোকালয়ে তোর স্থান হয় নাই, তখন আমি তোকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। যখন মানুষে তোকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আমি তোকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলাম। পাপিয়সি, মানুষি তুই, তুই সে উপকার বিস্মৃত হইয়াছিস্। আমি বলিয়াছিলাম গোকুলজীকে দিয়া তোর অমঙ্গল হইবে, তুইগোকুলজীকে পরিত্যাগ কর্। তুই তাহা পারিলি না, আবার গোকুলজীকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিস্। আমার কথা মিথ্যা হইবে? দেখ্, আমি এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠিত দেবতা। যে দিন আমি মিথ্যা বলিব, সে দিন এই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইবে। এখন কি তুই সুখে আছিস্? তোর সুখ কোথায়?"

তারা চক্ষু মুদ্রিত করিল। গম্ভীর বাণী নীরব হইল। তারার হৃদয়ে বারবার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল, সুখ কোথায়?

আবার দূরে মেঘ গর্জ্জিল। তারার শ্রবণে শব্দ পশিল, "চাহিয়া দেখ্!"

তারা চাহিয়া দেখিল। পাষাণপুরুষের চরণতলে সপ্ত পাষাণকন্যা ক্রীড়া করিতেছে, শুভ্র মেঘমালা তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ মুক্তকেশ দোলাইতেছে,—শুভ্র মেঘে যেন কৃষ্ণ সৌদামিনী খেলিতেছে। কাহারও মস্তকে ইন্দ্রধনু মুকুটের মত শোভিতেছে। কেহ প্রস্তরখণ্ড নীচে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিতেছে। একজন তারাকে দেখিতে পাইয়া অপর সকলকে ইঙ্গিত করিল। সকলে মিলিয়া তুষারশুভ্র অঙ্গুলি দিয়া তারাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার পর সর্ব্বকনিষ্ঠা দূরবংশীধ্বনিসম স্বরে তারাকে কহিল,

আমরা সাত ভগিনী, পিতা বলিয়াছেন, আমাদের আর এক ভগিনী আসিবে। তুমি সেই ভগিনী। মানুষের ঘরে জন্মিলে কি হয়? আমরা তোমাকে ছাড়িব না, তুমি আমাদের ছাড়িতে পারিবে না। একবার আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি বুঝি যথার্থই মানবী, সেইজন্য তোমাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম। সে কথা তুমি ভুলিয়া যাও। তুমি যখন পর্ব্বতে একাকিনী বাস করিতে তখন আমরা তোমায় রক্ষা করিতাম। তুমি আমাদের ভগিনী, আমাদের নিকটে এস। এখানে সুখদুঃখ নাই, শীত গ্রীষ্ম নাই, প্রণয়পাপ নাই। এস, আমাদের সঙ্গিনী হইবে!

তারা আবার চক্ষু মুদিল। বায়ুভরে মধুর কণ্ঠধ্বনি আন্দোলিত হইয়া ধীরে ধীরে মিশাইয়া গেল। পূর্ব্বে তারা এই সপ্তকন্যাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। এখন তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সুমধুর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে লাগিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সমীরণতরঙ্গে আবার অমৃতময় শব্দ ভাসিয়া আসিল, "দেখ! দেখ!"

চক্ষু মেলিয়া তারা দেখিল, সপ্তসুন্দরী পাষাণপুরুষকে ঘিরিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা ঘুরিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মেঘ ও ইন্দ্রধনু ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ছাড়াইয়া শূন্যে উঠিতে লাগিল। পাষাণপুরুষও সেই সময়ে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তুষারচক্ষু রমণীগণ হাসিতে হাসিতে তারাকে ডাকিতে লাগিল, "আয়! আয়!" ক্রমে তাহারা মেঘ ছাড়াইয়া, নীলাকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে

উঠিতে লাগিল, আর দূরকণ্ঠে আকাশ পূরিয়া ডাকিতে লাগিল, "আয়! আয়!" অপ্সরাকণ্ঠ, বেণুরবনিন্দিত কণ্ঠধ্বনির সহিত মধ্যে মধ্যে জলদগম্ভীর স্বরে শব্দ হইতে লাগিল, "আয়! আয়!" ক্রমে শব্দমাত্র রহিল, পাষাণপুরুষ ও পাষাণ-কন্যাগণ নক্ষত্রালোকে অন্তর্হিত হইল।

তারা কণ্টকিত গাত্রে অস্ফুট চীৎকার করিয়া জাগরিত হইল। গোকুলজী সজাগ ছিল, অস্ফুট চীৎকার শুনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কবিল, তারা, ভয় পাইয়াছ?

প্রথমবার জিজ্ঞাসা করাতে তারা শুনিতে পাইল না, দ্বিতীয়বারে উত্তর করিল, না, ভয় পাই নাই। একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

গোকুলজী জিজ্ঞাসা করিল, কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে?

তারা বলিল, আমি তাহা বলিব না। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিও না।

গোকুলজী মনে করিল, তারা স্বপ্নে পিতাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকিবে, এইজন্য কিছু বলিতেছে না। এই ভাবিয়া আর জিজ্ঞাসা কবিল না।

সে স্বপ্ন তারা আর ভুলিতে পারিল না। জাগ্রতে শব্দ শুনিতে লাগিল, "আয়! আয়!" একদিন তারা গোকুলজীকে কহিল, চল, একবার পাহাড়ে যাই।

গোকুলজী হাসিয়া কহিল, তুমি যে পাহাড়েব মায়া ছাড়িতে পাব না, দেখিতে পাই। পর্ব্বতবাসের সাধ কি এখনো মেটে নাই?

তারা বলিল, না, সে জন্য নয়। যেখানে এতদিন ছিলাম, সেখানে আর একবার যাইতে ইচ্ছা করে। আমার সে কুটীর তোমার দেখিতে ইচ্ছা হয় না কি?

গোকুলজী নিরুত্তর হইল। তাবা স্বামীকে কহিল, "আমরা দুইজনে যাইব, আর কাহাকেও সঙ্গে লইব না।" গোকুলজী স্বীকৃত হইল।

পর্ব্বতে উঠিবার সময় গোকুলজী বলিল, মনে পড়ে? এই স্থানে তোমায় দেখিয়াছিলাম?

তারা স্বামীর মুখে প্রেমপূর্ণ চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিল, মনে নাই? সেই তোমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

গোকুলজী হাসিতে লাগিল। কহিল, তখন ত ঘরে স্ত্রী ছিল না যে আমার

জন্য ভাবিবে। এখন ভাবিবার লোক হইয়াছে। কিন্তু তখন ভাবিবার আর একজন ছিল, সে আর এখন নাই।

এই কথা বলিতে বলিতে গোকুলজী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারা গোকুলজীর বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া আর কোন কথা কহিল না। দুইজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

তারার কুটীরে পঁহুছিতে বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া আসিবার কথা।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া গোকুলজী কহিল, তারা, তুমি বিনা সাহায্যে এ গৃহ কিরূপে নির্ম্মিত করিলে?

তারা হাসিয়া কহিল, তখন দাঁড়াইবার একটা স্থান ছিল না, গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে থাকি কোথা? আকাশের পাখী বাসা বাঁধিতে পারে, আর মানুষ একা একটা ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারে না?

কিছুকাল বিশ্রামের পর তারা আবার কহিল, আমার এই গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ। একদিন তুমি এখানে আহার কর নাই। আজ খাইতে হইবে। আমি ফল আহরণ করিব।

গোকুলজী তারার হাত ধরিয়া কহিল, সে সময়ের অপরাধ কি এখনো ভুলিতে পার নাই?

তারা। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। পূর্ব্ব কথা তুলিলে তুমি আপনাকে অপরাধী মনে করিও না। তোমাকে পাইয়াই আমার সুখ। আমার নিকটে তুমি অপরাধী?

এইরূপে দুইজনে অনেক কথা হইল। সেই শব্দহীন স্থানে প্রেমের মৃদু মৃদু কথা হইতে লাগিল। সে স্থানে কাহারও চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয় না, উচ্চ স্বরে কথা কহিতে সাহস হয় না। দম্পতী যুগল মৃদু গম্ভীর স্বরে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত করিল।

কতক্ষণ পরে তারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, তুমি একটু বস, আমি ফল আহরণ করিয়া লইয়া আসি।

গোকুলজী উঠিয়া, তারাকে বক্ষে ধরিয়া কহিল, তোমাকে একেলা যাইতে দিব না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

তারা কহিল, না, তাহা হইবে না। তুমি এইখানে আমার অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আমার এ অনুরোধ রাখিতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আসিও না।

গোকুলজী অনেক পীড়াপীড়ি করিল, তারা কিছুতে শুনিল না। অগত্যা গোকুলজী কুটীরে রহিল। তারা ফল আহরণে বাহিরে গেল।

তারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে দুই একখানি কালো মেঘ রহিয়াছে, তাহাতে দুর্যোগের কোন আশঙ্কা নাই; বিশেষ তখন শীতকাল, সে সময়ে ঝড়বৃষ্টি প্রায় হয় না। তারা নির্ভয়ে চলিতে লাগিল। যে দিকে ফলমূল পাওয়া যায়, সেই দিকে চলিল।

অকস্মাৎ একখণ্ড কৃষ্ণমেঘে সূর্য্য আবৃত করিল। তারা রোমাঞ্চিত কলেবরে শব্দ শুনিল, "আয়, আয়!" ফিরিয়া দেখিল, অতিদূরে শিখরশৃঙ্গে কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তারা কাঁপিতে লাগিল। তাহার শ্রবণে গম্ভীর, গম্ভীরতর শব্দ পশিতে লাগিল, "আয়! আয়!" পরিশেষে সহস্র মেঘগর্জ্জন তুল্য ধ্বনি গর্জ্জিতে লাগিল, "আয়, আয়!" তারার সম্পূর্ণ আত্ম বিস্মৃতি হইল। যে দিকে পাষাণদেবতার মূর্ত্তি দেখিল, সেইদিকে অস্থির গতিতে অগ্রসর হইল। সে পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং পিচ্ছিল।

তারার পশ্চাতে ঝটিকা গর্জ্জিতেছিল। সে গর্জ্জন সে শুনিতে পাইল না। কম্পান্বিত কলেবরে মহাকায় পুরুষের অভিমুখে চলিল। শিলাচূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল, তবু সে ফিরিল না। কিছু দূর গিয়া সহসা তাহার পদস্খলন হইল। ঝটিকার তীব্রকণ্ঠের সহিত অতি বিকট চীৎকার মিশাইয়া গেল।

গোকুলজী, তারার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার অন্বেষণে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার করিয়া ঝটিকা বহিল। গোকুলজী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্রুতপদে ইতস্ততঃ তারার অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, তারা! তারা! অনেক দূর দ্রুতগমনে গিয়া, গোকুলজী অতি বিকট চীৎকার শুনিতে পাইল। অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইল।

যে মৃত্যুমুখ হইতে তারা গোকুলজীকে রক্ষা করিয়াছিল, স্বয়ং সেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। গোকুলজী মৃতের মত পতিত রহিল।

উভয়ের বধির শ্রবণে ঝটিকা গর্জ্জিতে লাগিল।

সমাপ্ত।